আসামের ইতিহাস

'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'বিক্রমপুরের বিবরণ', (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
'কেদার রায়', 'ইংলণ্ডের ইতিহাস,' 'ছেলেদের হিন্দুস্থান,' 'সোণার ভারত,'
'বাঙ্গালার ইতিহাস,' 'গ্রীক,' 'রোম,' 'মিসর', 'আরব,' 'প্রাচীন জগৎ,'
'বর্ত্তমান জগৎ', 'আদিম জগৎ', 'বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ,
'ভারতের ইতিবৃত্ত', 'পরশমণি,' 'লক্ষ্যপথে,' মাধবী,
'রূপকথা,' 'অর্জ্জুন,' বিদ্যাসাগর,' 'ধ্রুব,' 'প্রহ্লাদ' ইত্যাদি
বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা,—ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট
বোর্ডের পরীক্ষক ও ঢাকা জগন্নাথ
কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ধর, বি. এ.
পপুলার এজেন্সী,
১৬৩নং মুক্তরামবাবু ষ্ট্রিট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

ঢাকা,
নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন প্রেসে
শ্রীরাধাবল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত
১৩৩৬

ভূমিকা

আমি অনেকবার আসাম বেড়াইয়াছি। আসামের নদী, পাহাড়, বন-জঙ্গলের সুন্দর শ্যামলশ্রী এবং বিস্তৃত প্রান্তরের তরঙ্গায়িত শোভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এইরূপ পর্য্যটনের ফলেই আমি আসামের ইতিহাস লিখিতে উদ্বুদ্ধ হই, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা তাহারি ফল।

আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা অতি অল্প কথাই জানি। এক সময়ে এই বিস্তৃত পার্ব্বত্য প্রদেশেই মঙ্গোলীয়জাতির নানা শাখা-প্রশাখার সম্মেলন হইয়াছিল। এইখানেই একদিন অসুররাজারা অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে রাজত্ব করিয়া সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির ও ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন পৌরাণিক পুঁথিতে, তন্ত্র এবং কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র ও মহাভারতে আসামের অনেক কথা আছে। মহাভারতে আসামের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর উল্লিখিত আছে। পুরাণে ও তন্ত্রে আসাম কামরূপ নামে পরিচিত। আহোমরাজাদের বীরত্ব-বাণী আজ পর্য্যন্তও আসামের ঘরে ঘরে পরিকীর্ত্তিত। মুসলমান-বাদশাদের সহিত আহোমরাজাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ঐতিহাসিক গর্ব্বের বিষয়। মুসলমাননৃপতিরা পুনঃ পুনঃ অভিযান প্রেরণ করিয়াও আহোমরাজাদিগকে পরাজিত করিয়া আসামরাজ্য করতলগত করিতে পারেন নাই।

আসামের তান্ত্রিকধর্ম্মের প্রভাব ও বিস্তার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে। গৌহাটির কামাখ্যাদেবীর মন্দির শাক্ত হিন্দুদের কাছে বরাবরই পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

আসামের অতি প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার উপায় নাই, কেননা মুসলমানদের ভারতাগমনের পূর্ব্বে ভারতীয়েরা রীতিমত ভাবে ইতিহাস রচনায় মনোযোগী ছিলেন না। আসাম-বিজেতা আহোমেরা ইতিহাস রচনায় একান্ত অনুরাগী ছিলেন। খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বুরুঞ্জী লেখা আরম্ভ হয়। প্রায় এ সময়েই উড়িষ্যা দেশে "মাদলাপঞ্জীর" আরম্ভ। আমাদের বাঙ্গালাদেশের কুলপঞ্জী ইহারও পূর্ব্ব হইতে লিখিতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। আসামীভাষার বুরুঞ্জী, আসামীদের গৌরবের জিনিষ। 'আসামের ইতিহাস' লেখক গেইট্ সাহেব তৎপ্রণীত A History of Assam নামক গ্রন্থে বুরুঞ্জীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"The Ahom conquerors of Assam had a keen historical sense ; and they have given us a full detailed account of their rule, which dates from the early part of the thirteenth century." বুরুঞ্জির সাহায্যে আসামের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারি। আহোমদের সহিত মোগলদের বহুবার যুদ্ধ হইয়াছে, যুদ্ধে আহোমেরা বিজয়ী হইয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সে-সকল যুদ্ধের পরিচয় আহোমদের লিখিত 'বুরুঞ্জি' ও মুসলমানঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতে প্রকৃত ভাবে জানিতে পারা যায়। সেকালের যুদ্ধের রীতি-নীতি, অস্ত্র-শস্ত্রের পরিচয়, যুদ্ধবিধি ঐ সকল ঐতিহাসিক বিবরণী হইতে জানিতে পারি।

ইংরাজীতে 'Descriptive Account of Assam' নামক আসামের ইতিহাস সম্পর্কিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের লেখক মিঃ রবিন্‌সন্ (Robinson)। আসামী

ভাষায়—কাশীনাথ তামুলি ফুকন্ এবং স্বর্গীয় গুণাভিরাম ফুকন্ আহোমদের কথা ও আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গৌহাটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূইঞা, এম. এ. মহোদয় বর্ত্তমান সময়ে আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করিতেছেন।

আসামের বন-জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে দেখিবার ও জানিবার অনেক কিছু আছে। সে-সকলের এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া অনুসন্ধান হয় নাই। ক্রমশঃ তাহা হইবে বলিয়া মনে করি। আসামের পার্ব্বত্য-জাতি সমূহের বিস্তৃত বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক এবং জানিবার বিষয় বটে, সে সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে এই পুস্তকে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে বহু লেখকের গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে Sir Edward Gait, K. C. S. I. C. I. E. প্রণীত 'A History of Assam' (দ্বিতীয় সংস্করণ), 'The History and Antiquities of Eastern India' by Mortgomery Martin এবং অন্যান্য বিবিধ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত জেলার বিবরণী পুস্তক ও নানা ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকা জগন্নাথকলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ধর, বি, এ, মহাশয় আমাকে নানাপ্রকার প্রাচীন গ্রন্থ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বাঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন আলোচনা হইয়াছে কিনা এবং প্রামাণিক কোন পুস্তক প্রকাশিত

হইয়াছে বলিয়া জানিনা। কাজেই আশা করিতেছি যে আমার এই প্রচেষ্টাকে ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিগণ সহানুভূতির চক্ষে দেখিবেন।

ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিগণ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ গ্রন্থখানার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে অনুগৃহীত হইব।

৬৫নং স্বামীবাগ রোড্
ঢাকা
১৭ই ভাদ্র—১৩৩৬ সন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচী

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

খ্যান্ রাজবংশ

চতুর্থ অধ্যায়

কোচারি আধিপত্য—কোচরাজাদের কথা

পঞ্চম অধ্যায়

আহোমরাজাদের কথা

ষষ্ঠ অধ্যায়

আহোমরাজাদের উন্নতির যুগ ও শাসন-বিধি

সপ্তম অধ্যায়

আহোমদের শাসন-প্রণালী

অষ্টম অধ্যায়

কাছাড় ও কাছাড়ি রাজ্য

নবম অধ্যায়

জয়ন্তিয়া রাজ্য

দশম অধ্যায়

মণিপুর রাজ্যের কথা

আসামের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন কথা

প্রাচীন অধিবাসীদের পরিচয় ও ভাষা

আসামের অতি প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার কোনও উপায় নাই। সে প্রায় সাতশো বছর আগে আহোম রাজারা যখন আসাম দেশ আক্রমণ করেন সে সময় হইতেই আসামের ইতিহাস অনেকটা সত্য ভাবে জানিতে পারা যায়। তার আগে আসাম সম্বন্ধে আমরা চীন দেশীয় পর্য্যাটকগণের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে এবং মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি।

অতি প্রাচীন কালে এই পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গলে ঢাকা আসামের সমতল ভূমিতে ছিল ভীষণ হিংস্র জন্তুদের বাস। সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক এমন কি গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি ভয়ানক হিংস্র জন্তুরা এসকল বনাকীর্ণ প্রদেশে মহা আনন্দে বিচরণ করিত ভারত-বর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গিরি-পথ দিয়া যেমন সেই সুদূর অতীতে এক দিন আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন,

মঙ্গোলিয় জাতির আগমন

ঠিক্ তেমনি ভাবে হিমালয়ের পূর্ব্ব ভাগ দিয়া মঙ্গোলীয় নামক এক জাতি দলে দলে আসামে আগমন করে। তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির কথা শোন। তাহারা দেখিতে ছিল খর্ব্বকায়, গায়ের রং ছিল তাদের পীতবর্ণ, চেপ্টা চওড়া নাক,—কিন্তু তারা ছিল বেশ শক্তিশালী। এই মঙ্গোলিয় জাতির লোকেরা ধীরে ধীরে সুরমা উপত্যকা ব্যতীত সমুদয় আসাম দেশ ও উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এসকল আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সভ্যতার নাম মাত্র ও ছিল না। তাহারা বস্ত্রের ব্যবহার জানিতনা, কৃষি-কার্য্য করিতে জানিত না, পশুবধ করিয়া জীবন-ধারণ করিত। পশু-বধের জন্য পাথরের তৈয়ারী অস্ত্রের ব্যবহার করিত। অগ্নির ব্যবহারও ছিল তাহাদের অজ্ঞাত। প্রথমটায় ইহারা উলঙ্গ থাকিত কিন্তু ক্রমে ক্রমে গাছের বাকল পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। এই অসভ্য জাতিরা নানা দলে বিভক্ত ছিল। এক এক দল এক এক প্রকার ভাষার ব্যবহার করিত। ইহাদের ভাষার সাধারণ নাম ছিল মুণ্ডা। নাগা পাহাড়ের নাগারা কথা বলিত নাগা ভাষায়, মণিপুর, কাছাড় এবং লুসাই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল কুকি চিন ভাষা। আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মেচ, গারো, লালুং রাভা, চুটিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে বৌদ্ধ ভাষা। বর্ত্তমান সময়ে তাই বা শান্ ভাষাও কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। খাসিয়া ভাষার সহিত এসকল ভাষার কোনও মিল নাই।—অনেকের মতে খাসিয়ারাই এক মাত্র তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ মোঙ্গোলিয়দের ভাষা অবিকৃত রাখিয়াছে। অনেকে বলেন যে এই জাতিয় লোকেরা কেবল যে আসামেই স্থায়ী ভাবে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা নহে

ভাষার কথা

তাহারা ছোট নাগপুরের বিভিন্ন স্থানে এমন কি পঞ্জাব পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আসাম উর্ব্বর দেশ। নদ-নদী-পর্ব্বত-জঙ্গল-বেষ্টিত এই দেশের মাটিতে সোণা ফলে। অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়, কোন ক্লেশ করিতে হয় না, তার পর এদেশের আর্দ্র জল-বায়ুতে ক্রমশঃ অবসাদ ও আলস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারি ফলে একদল কিছুকাল এ অঞ্চলে বাস করিবার পরেই ক্রমশঃ অলস ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত—ফলে আর একদল আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিত, আবার আর একদল আসিত, এই ভাবে নানা জাতির ধারা আসিয়া এদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিল। ১২২৮ খ্রীঃ অঃ আহোমেরা এদেশে আসেন। আহোমেরা প্রায় ছয়শত বৎসর কাল আসামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপ দীর্ঘকাল আসামে রাজত্ব করিবার ফলে তাঁহাদের ভাষার প্রভাব আসামের আদিম অধিবাসীদের ভাষার উপর বিস্তার লাভ করিয়া মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। আহোমেরাই নানা দিক্ দিয়া নানা ভাবে আসাম প্রদেশের উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমরা পরে জানিতে পারিবে।

আহোমদের আগমন ও ভাষার প্রভাব

সে অতি প্রাচীন যুগে কোন্ কোন্ রাজা আসামে বেশ একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন সে কথা বেশ ভাল করিয়া জানা যায় না। অতি আদি যুগ হইতেই যে হিন্দু বীর ও ব্রাহ্মণ যাজকগণ আসাম অঞ্চলে আসিয়াছিলেন সে কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অনেকের মতে সমুদা নামে একজন হিন্দু নৃপতি ব্রহ্মদেশে যাইবার পথে আসামের মধ্য দিয়াই গমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার সঙ্গী দলের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আসামেই রহিয়া

সমুদা বা সামুদা রাজা

গিয়াছিলেন। সমুদা ১০৫ খ্রীঃ অঃ ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬৪০ খ্রীঃ অঃ ও একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। এই হিন্দু নৃপতি আপনাকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপ দুই একজন হিন্দু রাজার কথা জানিতে পারিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সে কালে হিন্দু-অধিবাসীর সংখ্যা আসামে ছিল খুবই কম, কাজেই হিন্দুদের কোন প্রভাব প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা তাহাদের প্রাচীন ভাবে অনার্য্য আচার ব্যবহার লইয়াই জীবন কাটাইত।

পৌরাণিক যুগ

প্রাচীন পৌরাণিক পুঁথিতে, তন্ত্র গ্রন্থে এবং মহাভারতে আসামের অনেক কথা আছে। মহাভারতে আসামের নাম **প্রাগ্ জ্যোতিষপুর** উল্লিখিত আছে। পুরাণে ও তন্ত্রে আসাম—**কামরূপ** নামে পরিচিত। মহাভারতে আসামের সীমা অত্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়—সে সময়ে পশ্চিমে করতোয়া নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সে কালে করতোয়া অতি বিখ্যাত নদী ছিল। তিস্তা, কোষি ও মহানন্দা নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। গঙ্গার ন্যায় করতোয়াও পুণ্য সলিলা এবং পাপ-তাপ-হারিণী নদী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কালিকা-পুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণের মতে গৌহাটির নিকটবর্ত্তী কামাখ্যা দেবীর মন্দির আসামের কেন্দ্র স্থানে অধিষ্ঠিত

প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুর ও কামরূপ

বলিয়া কথিত আছে। ঐ মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকের এক শত যোজন বিস্তৃত (৪৫০ মাইল) পরিমাণ স্থান লইয়া আসাম রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই পৌরাণিক মত মানিয়া লইতে হইলে পূর্ব্ব বঙ্গ, ভুটান ও সমগ্র আসাম প্রদেশ লইয়া আসাম প্রদেশ বিস্তৃত ছিল এইরূপ মনে হয়—ইহা যে অতিরঞ্জিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মহাভারতের পরবর্ত্তী যুগে বিরচিত 'যোগিনী-তন্ত্র' হইতে জানিতে পারি যে সেকালে কামরূপের সীমা—পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে দিখু নদী, উত্তরে কাঞ্জগিরিশ্রেণী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়।—এই তন্ত্রের মতে সেকালের কামরূপ রাজ্য—চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল।

পৌরাণিক আসাম

কামপীঠ—করতোয়া এবং সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্য স্থিত ভূ-ভাগ। বর্ত্তমান রংপুর জেলা।

সুবর্ণপীঠ—ভরলী ও রূপৈ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। কামরূপ ও দরঙ্গ। ভদ্রপীঠ নামে পরিচিত।

রত্নপীঠ—রূপৈ নদী হইতে সুবর্ণ রেখা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। (বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা)

সৌমার পীঠ—ভরলী নদী হইতে দিক্রাং নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ। (লক্ষীমপুর ও শিবসাগর জেলা) সতীর মৃত্যুর পর শিব সতী দেহ স্কন্ধে লইয়া যখন দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু তাঁহার এইরূপ ক্লেশ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় চক্র দ্বারা সতী দেহ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। গোহাটির নিকটবর্ত্তী নীলাচলেও তাঁহার দেহের এক অংশ পতিত হইয়াছিল। তদবধি নীলাচল কামাখ্যা নামে পরিচিত হইয়া তীর্থ স্থানে পরিণত

কামরূপ নামের উৎপত্তি

হইয়াছে। মহাদেব তথাপি তপস্যায় ক্ষান্ত হইলেন না দেখিয়া দেবতারা ভীত হইলেন, ভাবিলেন শিব যদি এইরূপ তপস্যা করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া পড়িবে—আর কোনও দেবতার কোন প্রভাব থাকিবে না,—তখন তাঁহারা কামদেবকে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য পাঠাইলেন—হরকোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইলেন। কামদেব এই প্রদেশেই পূর্ব্বরূপ পাইয়াছিলেন বলিয়া এদেশের নাম হইয়াছে **কামরূপ**।

আসাম নামোৎপত্তির ইতিহাস

পরবর্ত্তী কালে কামরূপ আসাম নামে পরিচিত হয়। আসাম নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলেন। পূর্ব্ব কালে পূর্ব্ব বঙ্গের নাম যেমন ছিল সমতট, তেমনি পর্ব্বত-বন-জঙ্গল-পরিবেষ্টিত উচ্চ ও নিম্ন উপত্যকাদিতে পরিপূর্ণ অসমতল ভূমি অসম নামে অভিহিত হইতে থাকে। এই অসম হইতেই আসাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন আহোম রাজাদের নামানুসারে আহোম হইতে আসাম হইয়াছে।

অসুর রাজাদের কথা

অতি প্রাচীন কালে মহীরাং দানব নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। ইঁহাকেই অসুর বংশীয় রাজাদের প্রথম রাজা বলা যাইতে পারে। মহীরাং দানবের পরে একে একে এই অসুর রাজবংশে **হটক অসুর, সম্বর অসুর, রত্নাসুর** প্রভৃতি রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অসুর রাজাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছুই জানা যায় না। **দানব** এবং **অসুর** এই শব্দ হইতে

অসুর রাজবংশ

কামাখ্যা দেবীর মন্দির

বুঝিতে পারা যায় যে অসুর রাজারা অনার্য্য ছিলেন। * এই অসুর রাজাদের পরে কিরাত বংশীয় **ঘটক** নামে একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি কামরূপে রাজ্য স্থাপন করেন। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস পড়িলে জানিতে পারা যায় যে প্রাচীন কালে ত্রিপুরা রাজ্য কিরাত রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুকাল পরে অসুর বংশীয় নরকাসুর ঘটককে পরাজিত ও নিহত করিয়া কামরূপের সিংহাসন লাভ করেন। নরকাসুরের নাম পুরাণ ও তন্ত্রে উল্লেখ আছে। **নরকাসুর** কামরূপের রাজধানী বর্ত্তমান গৌহাটি নগরে স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে গৌহাটির নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। নগরের চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি নগরকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। গৌহাটির কাছে একটী ছোট পাহাড় এখনও নরকাসুরের পাহাড় নামে পরিচিত। নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ও কামাখ্যায় বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বঙ্গদেশ ও মিথিলা হইতে এই সকল ব্রাহ্মণেরা কামাখ্যাদেবীর পূজার নিমিত্ত নীত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে নরকাসুর বহু অর্থ ও ভূমি দান করেন। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে করতোয়া ও পূর্ব্বে দিক্রাং নদী পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। বিদর্ভের রাজ-কন্যা মায়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। নরকাসুর কামাখ্যাদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ধার্ম্মিক ও

কিরাত বংশীয় ঘটক রাজা

নরকাসুর ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর

* অনেকে এই অসুর রাজাদের সহিত এসিরিয়ান্ বা অসুর জাতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাহেন।—The Social History of Kamrupa by N. Basu—Introduction. Page 3. Page 12. (or) Danub & Assur suggest that they were Non-Aryans. Gait's History of Assam.

প্রজাবৎসল বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, পরে শোণিতপুরের (তেজপুর) রাজা বাণ অসুরের প্রভাবে পড়িয়া অত্যাচারী, অহঙ্কারী ও অধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। এমন কি কিংবদন্তী এই যে এক সময়ে যে কামাখ্যাদেবীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, শেষটায় কিনা তিনি সেই কামাখ্যাদেবীকেই বিবাহ করিতে চাহিলেন! কামাখ্যাদেবী বলিলেন—"আমি তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি, যদি তুমি এক রাত্রির মধ্যে নীলাচলের উপর আমার জন্য একটী মন্দির, দীঘী ও পথ তৈয়ারী করাইয়া দিতে পার।" নরকাসুর সম্মত হইয়া বহু লোক-লস্কর লাগাইয়া দিলেন। কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময় কামাখ্যাদেবীর কৌশলে হঠাৎ একটা কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল, কাজেই ভোর হইয়াছে মনে করিয়া রাজমিস্ত্রী ও মুটে মজুরেরা কাজ ফেলিয়া চলিয়া গেল। কামাখ্যাদেবীর আর নরকাসুরকে বিবাহ করিতে হইল না। নরকাসুর যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কুক্কুটটিকে কাটিয়া ফেলিলেন। যে স্থানে তিনি কুক্কুটটিকে কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন আজও সেস্থান **'কুক্‌কুরা-কাটা'** নামে পরিচিত। এই ঘটনার পর হইতেই নরকাসুর দেবীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেন। এখানেই নরকের শিক্ষা হইল না। বশিষ্ঠমুনি একবার কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন— নরকাসুর তাঁহাকে যাইতে বাধা দিলেন। বশিষ্ঠমুনি অমনি শাপ দিলেন যে আজ হইতে যে কেহ কামাখ্যাদেবীকে পূজা করিবে তাহার কামনা কখনও পূর্ণ হইবে না। নরকের অত্যাচারে প্রজা জন-সাধারণ এমনকি মুনি ও ঋষি দেবতারাও যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ নরকের রাজ্য আক্রমণ করিয়া নরককে

নরকাসুরের পতন

পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভগদত্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ভগদত্তকে ভগীরথ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

ভগদত্ত

মহাভারতে ভগদত্তের নাম আছে। ভগদত্ত সে সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অর্থাৎ পূর্ব্বদেশের একজন বলবান্ নরপতি ছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় কাহিনীতে ভগদত্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধের কথা জানিতে পারা যায়। "সপ্তদ্বীপমধ্যে শাকলদ্বীপে যে সকল রাজারা বাস করিতেন অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশ আক্রমণার্থে ধাবিত হইলেন। ঐ দেশে ভগদত্ত নামে মহান্‌রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগরতীরস্থ অন্যান্য অনূপদেশবাসী বহুসংখ্যক যোধগণের সহিত সমবেত ছিলেন। ঐ নরেশ্বর অষ্টাহ যুদ্ধের পর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনঞ্জয়কে সহাস্যবদনে এই কথা বলিলেন আপনি অসাধারণ বীর, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু এবং যুদ্ধেও তাঁহার অপেক্ষা হীন নহি। তথাপি সমরে তোমার সন্মুখে স্থির থাকিতে পারিলাম না। তোমার কি অভিপ্রায় তাহা বলিলে আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।" অর্জ্জুন কহিলেন, "কুরুগণমধ্যে প্রধানতম ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ, সত্য-প্রতিজ্ঞ এবং দানশীল—তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ হয় তাহাই আমি ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন।" ভগদত্ত কহিলেন—"তুমি আমার যেরূপ প্রীতিপাত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ, অতএব আমি অবশ্যই এসমস্ত অনুষ্ঠান করিব। মহাবাহু ধনঞ্জয় এই-রূপে প্রাগ্‌জ্যোতিষ জয় করিয়া আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন।"

ভগদত্ত সাধারণতঃ কিরাত রাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। প্রজাদের অবস্থা দেখিবার জন্য দৈবশক্তিসম্পন্ন এক গজ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজ্য দর্শন করিতেন। কিংবদন্তী এই যে ময়মনসিংহে 'বারতীর্থ' নামক স্থানে মধুপুর অরণ্যমধ্যেও তাঁহাদের এক রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভগদত্ত দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষটায় অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। কথিত আছে দুর্য্যোধন ভগদত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; সেজন্যই বোধ হয় ভগদত্ত কৌরব পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

বজ্রদত্ত

ভগদত্তের পর তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত* রাজা হন। নরকাসুরের বংশধরের ঊনবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত আসামে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম ছিল **সুবাহু**। নরকাসুর বংশীয়দের সকলেরই রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। বর্ত্তমান গৌহাটি সহরই প্রাচীনকালের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। প্রাগ্‌—অর্থ পূর্ব্ব, জ্যোতিষ-অর্থ তারা—জ্যোতিষশাস্ত্র, কাজেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থে পূর্ব্ব দেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলনের সহর।

সেকালে আসামের অনেক রাজা আপনাদিগকে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ' উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতেন।

আসামের পৌরাণিক ইতিহাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। ভাগবতে আছে যে সেকালে আসামের

* মহাভারতে ও প্রাচীন তাম্রফলকে বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র বলিয়াই কথিত আছেন। পরবর্ত্তীকালের তাম্রফলকে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের ভ্রাতারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সদিয়া অঞ্চলে বিদর্ভ নামে এক রাজ্য ছিল। ভীষ্মক নামে নৃপতি সেদেশে রাজত্ব করিতেন। কুণ্ডিনাতে তাঁহার রাজধানী ছিল। সদিয়ায় কুণ্ডিল নদীর ধারে এখনও প্রাচীনকালের কুণ্ডিনা নগরীর একটী প্রাচীনদুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষ্মক রাজার পাঁচপুত্র ও রুক্মিণী নামে এক কন্যা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই রাজকন্যার অপরূপ রূপ-মাধুরীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া ভীষ্মকের অভিমত চাহিলেন। ভীষ্মক এই বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া ভীষ্মকের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজকন্যা রুক্মিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইয়া বিবাহ করেন।

ভীষ্মক

ভাগবতপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে আর একজন রাজার কথা আছে তাঁহার নাম বালি। বালি রাজার রাজধানী ছিল শোণিতপুর (তেজপুর)। তিনি অনেকদিন শোণিতপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বালির মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র বাণ শোণিতপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাণরাজা নরকাসুরের সমকালবর্ত্তী রাজা ছিলেন। বাণ রাজার অনেক পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা ছিল। কন্যার নাম ছিল ঊষা। ঊষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গোপনে শোণিতপুরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া গন্ধর্ব্বমতে ঊষাকে বিবাহ করেন। বাণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বাণ রাজাকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ঊষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন।

বালি ও বাণ

ঊষা ও অনিরুদ্ধ

বর্ত্তমানে যেখানে তেজপুরের আদালত ও কাচারি ইত্যাদি

অবস্থিত, কথিত আছে এখানেই পূর্ব্বে বাণ রাজার দুর্গ ছিল। এখনও এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর খোদিত প্রস্তর খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দীঘী সরোবর এখনও তাঁহার এবং তাঁহার পৌত্র ভালুকের নামের পরিচয় দিতেছে। আকা পাহাড়ের পাদদেশে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভালুকের রাজধানীর নাম ছিল **ভাল্লুকপুর**।

রঘুরাজ ও রঘুবংশ

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের চতুর্থ সর্গে লিখিত আছে যে রঘুরাজা লৌহিত্য নদ (ব্রহ্মপুত্র) অতিক্রম করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌-জ্যোতিষের রাজা কতকগুলি হাতী দিয়া রঘুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

অন্যান্য কিংবদন্তী মুলক রাজাদের কথা

আসামের এই সকল পৌরাণিক রাজা ছাড়া আরও অনেক ছোট বড় রাজার কথা জানিতে পারা যায়। যোগিনীতন্ত্রের মতে শকাব্দীর প্রচলনের সমকালে **দেবেশ্বর** নামে একজন শূদ্র রাজা কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয়শঙ্কর বা নাগাক্ষ্য নামক একজন রাজার কথাও জানিতে পারা যায়, এই রাজা চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতাপগড়ে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। মিমং, গজং, শ্রীবং ও মৃগং এই বংশের এই চারিজন রাজার নাম জানিতে পারা যায়। ইঁহারা প্রায় দুইশত বৎসরকাল লৌহিত্যপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল

ধর্ম্মপাল নামে একজন রাজা পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মপাল গৌহাটির পশ্চিমদিকে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং উত্তর ভারত হইতে বহু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ আনিয়া তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছিলেন। কেন্দু কুলাই নামক একজন মহাপুরুষ তাঁহার রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের পর তাঁহার বংশে একে একে পদ্মনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ ও রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেক রাজা রাজত্ব করেন। রামচন্দ্র এবংশের শেষ রাজা। **অমূর্ত্ত** নামে এক রাজাও আসামে রাজত্ব করেন। কিংবদন্তী এই যে অমূর্ত্ত রাজা রামচন্দ্রের নির্ব্বাসিতা পত্নীর পুত্র। অমূর্ত্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাজত্ব স্থাপন করেন, পিতা পুত্র কেহ কাহাকেও জানিতেন না, কাজেই একবার রামচন্দ্র অমূর্ত্তের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পিতা ও পুত্রে ভীষণ যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে রামচন্দ্র পুত্রের হস্তে নিহত হন। অমূর্ত্ত পিতৃবধের পাপ লাঘব করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অমূর্ত্তের রাজধানী ছিল কামরূপের অন্তঃভুর্ক্ত বেত্‌না নামক স্থানের কাছে বাইদারগড় নামক স্থানে। অমূর্ত্ত রাজার সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তীমূলক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

অমূর্ত্ত

এখানে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লিখিত একটী গল্পের উল্লেখ করিয়াই আমরা পৌরাণিক ও কিংবদন্তী মূলক ইতিহাস আলোচনার উপসংহার করিব। কথিত আছে কেদার বর্ম্মণ নামে একজন ক্ষমতাশালী রাজা উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন। সঙ্কল নামক একজন কোচবীর এই কেদার বর্ম্মণ রাজাকে পরাজিত করিবার জন্য বহু সৈন্য সহ বঙ্গদেশের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গদেশের রাজাকে পরাজিত করেন তারপর আরও বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কেদার বর্ম্মণকে আক্রমণ করেন ও ভীষণ যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। প্রবাদ এইরূপ যে সঙ্কলকোচই বঙ্গদেশের বিখ্যাত রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মৌতির প্রতিষ্ঠাতা।

সঙ্কল কোচ

দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত গৌড় বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল।* সঙ্কলকোচের চার হাজার হাতী, একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারিলক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল।

আমরা সংক্ষেপে আসামের রাজাদের যে পরিচয় দিলাম তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে। প্রাচীন পুঁথি পত্রে ও ধর্ম্ম গ্রন্থে আরও বহু রাজরাজড়ার নামধামও পরিচয় আছে। সে সকলের সম্বন্ধে আমরা আর কোন আলোচনা করিলাম না; বড় একটা অবশ্যকও নাই; কেন না, তাঁহাদের অনেকের কথাই গল্প ও গুজবের মত, সত্য ইতিহাস বড় একটা জানা যায় না।

* গৌড়নগর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের বিশেষ ভাবে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। গারো নামের সহিত গৌড় নামের সাদৃশ্য নাইত? শ্রীহট্টের কাছে গারোপাহাড়ের নীচেও গৌড়নামক একটী স্থান আছে। See—Gaits' History of Assam—Page 19.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাস

ইউ-আন্ চাংয়ের বিবরণ

আমরা প্রথমেই রাজা সমুদের কথা বলিয়াছি। রাজা সমুদ সেকালে খুবই পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপের মধ্যদিয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার সময় তাঁহার অনেক অনুচরেরা এই দেশে থাকিয়া যায়, তখন হইতে হিন্দু আর্য্যগণ কামরূপে ঘর-বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বেশ স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে চীনদেশের পর্য্যাটক ইউ-আন্-চাংয়ের লিখিত বিবরণ হইতে অনেক কথা জানা যায়। ইউ-য়ান-চাং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আসেন, ভারতের যে সকল প্রদেশে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সে সকল দেশের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন। ইউয়ানচাংয়ের লিখিত বিবরণী এবং বাণের রচিত হর্ষচরিতে কামরূপের বিষয় সামান্যতঃ যাহা উল্লিখিত আছে তাহা ছাড়া—আমরা আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারি তাহার বেশীর ভাগই খোদিতলিপি ইত্যাদি হইতে। সেকালের বড় বড় রাজারা কি করিতেন জান ?—যদি কাহাকেও কিছু দান করিতেন তাহা হইলে সেই দান পত্র তামার পাতে

লিখিয়া দিতেন। বড় বড় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া সেই সকল দান পত্র লিখিতেন। ঐ সকল দান পত্র যে রাজা দান করিতেন তাঁহার নিজের পরিচয় থাকিত—তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের কথা থাকিত, তারপরে যাঁহাকে দান করা হইত—তাঁহার নামধাম এবং যে ভূমি দান করা হইত তাঁহার সীমা ও বর্ণনা থাকিত। আসামের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার পক্ষে এইরূপ কয়েকখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে। এখানে তাহার কথা বলিতেছি।

১। ১৯১২ খ্রীঃ অঃ শ্রীহট্ট জেলার পাঁচখণ্ড গ্রামে কামরূপের রাজা **ভাস্কর বর্ম্মণের** দেওয়া একখানা তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে।

২। বনমাল প্রদত্ত তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে—১৮৪০ খ্রীঃ অঃ তেজপুরে।

৩। বালবর্ম্মণ প্রদত্ত তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে নওগাঁ জেলা হইতে। ১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ। এই তাম্রফলক হইতে জানা যায় যে **বলবর্ম্মণ** ৯৯০ খ্রীঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন।

৪। সুয়ালকুচ এবং বরগাঁওয়ে **রত্নপাল** প্রদত্ত তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছিল ১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ।

৫। গৌহাটিতে ইন্দ্রপাল প্রদত্ত তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছিল ১৮৯৩ খ্রীঃ অঃ।

৬। বৈদ্যদেব প্রদত্ত তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছিল কাশীর কামৌলি নামক পল্লীতে। এই দানপত্রের তারিখ ১১৪২ খ্রীঃ অঃ।

এ সমুদয় তাম্রফলকের লিখিত বিবরণ নানা পত্রিকায় পণ্ডিতেরা প্রকাশ করিয়াছেন।

তেজপুর পাহাড়ের খোদিত লিপি

তোমরা সকলেই তেজপুর সহরের কথা জান। তেজপুরের পাহাড়ের গায়েও খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতেও আসামের অনেক প্রাচীন কথা জানা যায়।

কুমার ভাস্কর বর্ম্মণ ও চীন-পর্য্যাটক ইউ-য়ান্‌চাং

কুমার **ভাস্কর বর্ম্মণ** যখন কামরূপের রাজা তখন তিনি ইউয়ান্‌চাংকে—তাঁহার রাজ্যে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। চীন পর্য্যাটক ইউয়ান্‌চাং নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কামরূপে আসিয়াছিলেন। ইউয়ান্‌চাং নালন্দা হইতে কামরূপ আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে কামরূপ রাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে "কামরূপ রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ লি অর্থাৎ ১,৭০০ মাইল। রাজধানীর আকারও প্রায় দশ মাইল হইবে। দেশের ভূমি নিম্ন। জলবায়ু আর্দ্র ও স্বাস্থ্যকর। এদেশে কাঁটাল ও নারিকেল গাছ খুবই বেশি। এদেশের লোকেরা সাধু-প্রকৃতির এবং চাল্‌-চল্‌তি সাদাসিধা। ইহারা খর্ব্বাকৃতি। গায়ের রং কালো ও পীতাভ। মধ্যভারতের ভাষা হইতে ইহাদের ভাষা অনেকটা ভিন্ন। এদেশের লোকেরা দেবদেবীর উপাসক। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কথা এবং বুদ্ধদেবের বিষয় এদেশের লোকেরা জানে না। কামরূপ অঞ্চলের কোথাও একটী সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধ মঠ দেখিলাম না। এদেশে দেবদেবীর মন্দিরের সংখ্যা খুবই বেশি। কামরূপের রাজার নাম ভাস্কর বর্ম্মণ। ইঁহার উপাধি কুমার। রাজা বিদ্যানুরাগী ও পরাক্রান্ত। তাঁহার বিদ্যানুরাগের জন্য দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখানে আসিয়া থাকেন। ভাস্কর বর্ম্মণ নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও বৌদ্ধ ভ্রমণকারিগণের প্রতি তিনি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কামরূপের পূর্ব্ব সীমানায় উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। এদেশে নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত এবং বন-জঙ্গল খুবই বেশি, সেজন্য সাপ,

বাঘ, ভল্লুক, হাতী প্রভৃতি বহু বন্য-জন্তুও বাস করে। এদেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব-প্রান্তে বন্য হস্তীরা নির্ভয়ে বিচরণ করে। আমরা কামরূপ হইতে সমতটে আসিয়াছিলাম। কামরূপ হইতে সমতটের দূরত্ব—১২০০, ১৩০০ লি অর্থাৎ প্রায় দুইশত মাইল। ভাস্কর বর্ম্মণের প্রদত্ত তাম্রফলক এবং অন্যান্য বিবরণ হইতে অনুমান করা যায় যে তিনি ৬৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভাস্কর বর্ম্মণের পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস বেশ ভাল ভাবে জানা যায় না। তাম্রফলকের বিবরণ হইতে কয়েকজন রাজা-রাজ্‌ড়ার নাম পাওয়া যায়। তারপর **শালস্তম্ভ** নামে একজন ম্লেচ্ছ বীর কামরূপের সিংহাসনারোহণ করেন। এই বংশে একে একে বিগ্রহ-স্তম্ভ, পালক-স্তম্ভ, বিজয়-স্তম্ভ প্রভৃতি অনেকেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ম্লেচ্ছ রাজারা রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শালস্তম্ভ হইতে পালবংশীয় রাজা ব্রহ্মপালের রাজত্ব পর্য্যন্ত প্রায় কুড়িজন নৃপতি কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

শালস্তম্ভ

তাম্রফলকে পরবর্ত্তী কালে প্রলম্ভ নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। প্রলম্ভ খুব সম্ভব ৮০০ খ্রীঃ অঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন। শালস্তম্ভের বংশ বোধ হয় ৮০০ খ্রীঃ অঃ সমকালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। প্রলম্ভের স্থাপিত রাজবংশের অনেক কথা অনেক কীর্ত্তি-কাহিনী, তেজপুরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে খোদিত লিপি এবং তেজপুর ও নওগাঁয়ে প্রাপ্ত দু'খানা তাম্রফলক হইতে জানিতে পারা যায়। প্রলম্ভের পর তাঁহার পুত্র হর্জ্জর কামরূপের রাজা হন। হর্জ্জরের পুত্র বনমাল এই বংশের একজন খ্যাতনামা নৃপতি ছিলেন। বনমাল দেখিতেও যেমন সুন্দর ছিলেন,

প্রলম্ভ

বনমাল

তেমনি সাহসী, প্রশস্ত বক্ষ, সুদৃঢ় শরীর এবং পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। পিতার ন্যায় বনমালও শিবভক্ত ছিলেন। বনমাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। কথিত আছে তাঁহার রাজ্য সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ কথা একেবারে উপেক্ষা করা চলে না, কেননা বাঙ্গালা দেশের পাল নৃপতি দেবপালের একখানা তাম্রফলক হইতে জানা যায় যে তিনি কামরূপের এক নৃপতিকে উড়িষ্যা-বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বনমাল যুদ্ধ-বিগ্রহে যেমন অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন, শান্তির সময়ে আবার তেমনি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের উন্নতির জন্য মন দিতেন। গল্প আছে যে বনমাল এক সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাহার তুলনা হয় না—সে প্রাসাদে অসংখ্য কক্ষ, কারুকার্য্য এবং চিত্র পরিশোভিত ছিল।

বীরবাহু

বনমালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়মল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বনমাল ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তিনি রাজ্য শাসন করা অপেক্ষা ধর্ম্ম কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই উপযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহার ছেলে বীরবাহু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বনমাল তাঁহার উপর রাজ্য-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া তিনি ধর্ম্মকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

বীরবাহু অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। বীরবাহু শেষজীবনে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় পুত্র বলবর্ম্মণকে সিংহাসন দান করেন। বলবর্ম্মণ দীর্ঘাকার, সাহসী এবং ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি যুদ্ধে যেমন সাহসী ও বীর, দানে, ধর্ম্মানুশীনে এবং প্রজাদের প্রতি

বলবর্ম্মণ

ব্যবহারে তেমনি সদাশয় এবং দানশীল ছিলেন। তিনি শিবভক্ত ছিলেন। হারুপেশ্বর নামকস্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। নওগাঁতে বলবর্ম্মণের প্রদত্ত যে তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে সেই তাম্রফলক বলবর্ম্মণ তাঁহার রাজধানী হরুপেশ্বর হইতে দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে হারুপেশ্বর নামক কোন স্থানের সন্ধান আসামে পাওয়া যায় না। বনমাল এবং বলবর্ম্মনের প্রদত্ত তাম্রফলকও তেজপুর পাহাড়ের খোদিত লিপি হইতে অনুমান হয়—হারুপেশ্বর সম্ভবতঃ বর্ত্তমান তেজপুরের নাম। প্রলম্ভের বংশীয় রাজারা "প্রাগজ্যোতিষ রাজ" উপাধি গ্রহণ করিতেন।

পালরাজ বংশ ব্রহ্মপাল

১০০০ খ্রীঃ অঃ অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই বংশের শেষ রাজা ত্যাগসিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করায় প্রজারা নরকের বংশধর ব্রহ্মপাল নামক পাল উপাধিধারী রাজাকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। ব্রহ্মপাল বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী, দয়ালু, ধার্ম্মিক এবং প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। শেষ বয়সে পুত্র রত্নপালের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়া তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রত্নপাল, পুরন্দর পাল ও ইন্দ্রপাল

রত্ন পালের পৌত্র ইন্দ্রপাল প্রদত্ত ভূমিদান পত্র হইতে জানা যায় যে রত্নপাল খুব সাহসী, রণ-নিপুণ রাজ্যশাসনদক্ষ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার ভয়ে শত্রুগণ সর্ব্বদা ভীত ভাবে থাকিত। তিনি সুন্দর সুন্দর গগনস্পর্শী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকার্য্যে বিবধ যজ্ঞানুষ্ঠানে হোমানলোত্থিত ধূম দ্বারা আকাশ সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন থাকিত। তিনি গুর্জ্জর, গৌড়, কেরল দাক্ষিণাত্যে এসকল রাজাদের সাহত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত এক রাজধানী নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন। রাজধানীর নাম রাখিয়াছিলেন "দুর্জ্জয়", তাঁহার রাজধানীতে বহু ধনী বণিক্, পণ্ডিত ব্যক্তি, কবি, ধর্ম্ম-প্রচারক প্রভৃতি নিরাপদে শান্তিতে বাস করিতেন। তাঁহার অধিকৃত ভুটানের তাম্র খনি হইতে তিনি বহু মূল্যের তাম্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বলা বাহুল্য সে সময়ে ভূটানও কামরূপ রাজ্যের অন্তঃর্গত ছিল।

রত্নপাল অনেক দিন রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের ছাব্বিশ বৎসর কালে প্রদত্ত তাম্রফলক হইতেই রত্নপালের দীর্ঘকাল রাজত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রত্নপালের পুত্র পুরন্দরপাল ধার্ম্মিক, দানশীল, প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। কবি বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। পুরন্দরপাল দুর্লভা নাম্নী এক ক্ষত্রিয়-রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দুর্লভাদেবীর গর্ভে ইন্দ্রপালের জন্ম হয়। পুরন্দর পাল পিতা রত্নপালের জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন বলিয়া তৎপুত্র ইন্দ্রপাল পিতামহের সিংহাসন লাভ করেন।

ইন্দ্রপাল জ্ঞানানুরাগী এবং অধ্যয়নশীল ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসিতেন না। তাঁহার শাসন সময়ে বাঙ্গালাদেশের সেনবংশীয় নৃপতি বিজয়সেন কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন।

খুব সম্ভব নবম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত পালরাজারা বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে কামরূপেও পাল শাসনকর্ত্তাদের কথা শ্রুত হওয়া যায়।

এইরূপ অনুমান হয় যে পাল রাজাগণ কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। একটা তাম্র ফলক হইতে জানা যায় যে কুমারপাল নামক পালবংশীয়

একজন নৃপতি গৌহাটির নিকট একখণ্ড ভূমি কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন। আরও জানা যায় যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের করদ নৃপতি তিষ্যদেব কুমারপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। কুমারপাল সেই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেব তিষ্যদেবকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কামরূপ রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। বৈদ্যদেব নিজকে মহারাজাধিরাজ উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বৈদ্যদেব দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কামরূপের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। বৈদ্যদেবের প্রদত্ত তাম্রশাসনের তারিখ ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহম্মদ্ বক্তিয়ারের আসাম আক্রমণ

১১৯৮ খ্রীঃষ্টাব্দে মুহম্মদ বক্তিয়ার দিল্লীর সম্রাট্ কুতুবদ্দীনের সেনাপতি করতোয়া নদী পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করেন। একজন মেচ্ সর্দ্দার তাঁহার এই আসাম-অভিযানে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। কোচ্, মেচ্, থারু প্রভৃতি নানাজাতিয় লোকের বাসস্থানের মধ্যদিয়া নদীর তীরে তীরে তাঁহাকে ক্রমাগত দশদিন পথচলিতে হইয়াছিল। কথিত আছে যে ঊনত্রিশটি প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান দ্বারা গঠিত এক সেতু পার হইয়া তাঁহার আসামের পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। উঁচু পাহাড়-পর্ব্বত ও বন জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া ষোলদিনের দিন বক্তিয়ার এক সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে আসিয়াছিলেন। সেখানে বহু জনাকীর্ণ পল্লী অবস্থিত ছিল। বক্তিয়ার গ্রামবাসীদের প্রতি অত্যাচার ও তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।—এ সময়ে একদল মঙ্গোলীয় সৈন্য তাঁহার গতি প্রতিরোধ করে। বক্তিয়ার নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। ফিরিবার পথে আসিয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বের সেই সেতুটি কামরূপের

রাজা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন। এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রচুর সৈন্য-সামন্ত লইয়া উপস্থিত-হইয়াছেন। নিরুপায় হইয়া বক্তিয়ার এক মন্দির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য করতোয়া নদী পার হইবার সময় সন্তরণকালে ডুবিয়া মরিল। বক্তিয়ার সামান্য কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কোনরূপে নদী পার হইয়াছিলেন। মেচ্‌দের সাহায্যে শেষটায় কোনরূপে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোটে যাইয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন।

মুহম্মদ বক্তিয়ারের পর ঘিয়াস্‌-উস্‌-দীন নামক বঙ্গের এক শাসনকর্ত্তা ১২২৭ খ্রীঃ অঃ ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তীর্ণ হইয়া সদিয়া পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। কামরূপবাসীরা তাঁহার সহিত বেশ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হটাইয়া দিয়াছিল। ঘিয়াস্‌ ও নিশ্চিন্ত মনে আসাম-অভিযানে মন দিতে পারেন নাই, কেননা ঘিয়াস্‌-উস্‌-দীন্‌ ঠিক্‌ সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্‌ আলতামসের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজধানী গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। ১২৫৭ খ্রীঃ অঃ পুনরায় বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন্‌ উজ্‌বক্‌ তুগ্রিল খাঁ আসাম আক্রমণ করেন। প্রথমটায় তিনি বেশ সফলকাম হইয়াছিলেন। বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ একটী মস্‌জিদ্‌ ও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ষার জল-প্লাবনে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সৈন্য সহ পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সৈন্যেরা বেশীরভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এদিকে কামরূপের রাজা তাঁহার পর্ব্বতাশ্রয় হইতে নামিয়া আসিয়া তুগ্রিল-খাঁকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে তুগ্রিল নিহত হইলেন। অল্প কয়েকজন সৈন্য কোনরূপে প্রাণ লইয়া বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিয়াছিল।

তুগ্রিলখাঁর আসাম-অভিযান

১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ্ আসাম জয়ের জন্য একলক্ষ সুসজ্জিত সৈন্য আসামে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই পরাজিত ও নিহত হইল—তাহারা কেহই আর ফিরিয়া আসিলেন না। মুহম্মদ দ্বিতীয়বার আসাম আক্রমণ করিলে আসামের বায়ভূঁইয়ার রাজারা মিলিত ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। মুহম্মদশাহ যখন আসাম আক্রমণ করেন, সে সময়ে সুবর্ণ শ্রী ও দিশংনদীর পূর্ব্বদিকে চুটিয়া রাজারা রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে নানা ছোট ছোট দলে বিভক্ত বোদো জাতির লোকেরা স্বাধীনভাবে বাস করিত। অনেকটা পশ্চিমদিকে ব্রহ্মপুত্রের বামতীরে কাচাড়িরা রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য বর্ত্তমান নওগাঁ জেলার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাচারি রাজ্যের দক্ষিণ দিকে 'ভূঁইয়া' নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারোজন অধিনায়কের রাজ্য ছিল। ভূঁইয়াদের রাজ্য সকল সময় সময় বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাইত। এই কয়েকজন রাজা এক কথায় বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত ছিলেন। বারোভূঁইয়া শব্দের ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গেও বারোজন ভূঁইয়া রাজা ছিলেন। আসামের এই বারো ভূঁইয়ার সম্বন্ধে আর একটু কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস আছে। আসামের বার ভূঁইয়ার রাজারা আপনাদিগকে জিতারি বংশের রাজা অরিমত্তের মন্ত্রী সমুদ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। সমুদ্র অরিমত্তের পুত্র রত্নসিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে সেই সিংহাসন অধিকার করেন। সমুদ্রের রাজ্য কামরূপ হইতে লক্ষ্মীমপুর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরবর্ত্তী ভূভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রের পর তাঁহার পুত্র মনোহর রাজা হন। মনোহরের পরে তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীদেবী রাজ্য লাভ

মুহম্মদ শাহ্

বারোভূঁইয়ার পরিচয়

সমুদ্র, মনোহর ও লক্ষ্মীদেবী

করেন। লক্ষ্মীদেবীর তুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে, একজনের নাম শান্তনু অপরের নাম সামন্ত। শান্তনু বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং সামন্ত হইলেন শাক্ত। ধর্ম্মের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রাজ্য ও পৃথক্ হইয়া গেল। শান্তনু নওগাঁর রামপুরে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং সামন্ত লক্ষ্মীমপুরেই রহিয়া গেলেন। সামন্তের পুত্রগণ একে একে সিংহাসন লাভ করেন এবং বেশ বীরত্বের সহিত কাচাড়ি রাজাদের সমকক্ষ ভাবে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। শান্তনুর একজন বংশধর নওগাঁ জেলার অন্তর্গত বারদোয়া নামক স্থানে বাস করেন। সুবিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করদেব রাজধরের পৌত্র। রাজধরের পুত্র কুসুম্বর শঙ্করদেবের পিতা।

নওগাঁয়ের বারভূঁইয়াদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবরণও আছে। সেকালে কামতাপুরে তুর্লভনারায়ণ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সহিত ধর্ম্মনারায়ণ নামে এক রাজার যুদ্ধ হয়, ধর্ম্মনারায়ণ গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। সেকালে অনেক ছোট ছোট রাজারাও নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে এই উপাধি গ্রহণ করিতেন। সেকালে শ্রীহট্ট জেলার এক অংশের নামও ছিল গৌড়। ধর্ম্ম নারায়ণ কবে কোন্ সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন সে কথা ভাল করিয়া জানা যায় না তবে কিংবদন্তী এইরূপ যে ধর্ম্মনারায়ণ তুর্লভের নিকট সাতঘর ব্রাহ্মণ ও সাতঘর কায়স্থ পরিবার পাঠাইয়া দেন। তাহাদিগকে বাড়ীঘর ও জমিজমা দিয়া তুর্লভ থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই কায়স্থদের মধ্যে **চণ্ডীবর** ছিলেন প্রধান। তাহারা পাইমাগুড়ি নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া এই

কায়স্থগণ স্থানীয় অধিবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। একবার ভুটিয়ারা অতর্কিত আক্রমণ করিয়া চণ্ডীবরের পুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, চণ্ডীবর অপর ভূঁইয়াদের সাহায্যে ভুটিয়াদিগকে পরাজিত করিয়া পুত্রকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে ইঁহারা নওগাঁও জেলার বরদোয়া নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। চণ্ডীবরের প্রপৌত্রই হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করদেব। ইঁহারাও আপনাদিগকে বারভূঁইয়া বলিয়া অভিহিত করেন। সে যাহাই হউক এই বারভূঁইয়াদের সম্মিলিত শক্তির কাছে মুহম্মদ শাহ পরাজিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

খ্যান্ রাজবংশ

পালরাজাদের পতনের পর খ্যান্ নামে পরিচিত আদিম অধিবাসীদের একজন সর্দ্দার কামরূপ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার কামাতাপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। খ্যানেরা কোন্ জাতি তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই, তবে তাঁহারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের ও আসামের নানাজাতির সহিত মিলিয়া গিয়াছিল। এই বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রথমে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিতেন। এই ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে কালে এই খ্যান্ বালক রাজা হইবে। পালরাজ বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পক্ষে এই ব্রাহ্মণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সাহায্যে বহু সৈন্য সংগৃহীত হইল এবং দুর্ব্বল পাল রাজারা তাঁহার হস্তে পরাজিত হইল। খ্যান্ সর্দ্দার "নীলধ্বজ" এই হিন্দুনাম ধারণ করিয়া কামরূপের রাজা হইলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বতন মনিবকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার রাজধানী হইল **কামাতাপুর**। কামাতাপুর ধর্লা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। কথিত আছে যাজন-কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য মিথিলা হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে উপনিবেশিত করিয়াছিলেন। নীলধ্বজের এইরূপ উদারতায় ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর শূদ্ররূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। নীলধ্বজের রাজধানী কামাতাপুরের পরিধি ছিল নয় ক্রোশ।

নীলধ্বজ

চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর

নীলধ্বজের পরে তাঁহার পুত্র চক্রধ্বজ রাজসিংহাসন লাভ করেন। চক্রধ্বজের পরে তাঁহার পুত্র নীলাম্বর রাজা হইলেন। নীলাম্বর এই বংশের শেষ রাজা। নীলাম্বর তাঁহার রাজ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য সীমা পূর্ব্বদিকে বরনদী এবং পশ্চিমে করতোয়ার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তর পূর্ব্বদিকের যে ভূভাগ মুসলমানেরা এক সময়ে অধিকার করিয়াছিলেন নীলাম্বর সে সকলের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। পথঘাটের উন্নতির জন্য নীলাম্বর রাজা বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে সুন্দর সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কোচ বিহার, রঙ্গপুর এবং বগুড়া জেলার মধ্যে তাঁহার নির্ম্মিত পথের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে।

হুশেন শা কর্ত্তৃক কামরূপ বিজয়

নীলাম্বর রাজার পতন সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে নীলাম্বরের পুত্র বিবিধ অসদাচরণে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের প্রতি যারপর নাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ পলায়ন করিয়া বঙ্গের গৌড় নগরে যাইয়া নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে হুশেন শা বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা হুশেন শাকে কামরূপ আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। হুশেন শা কামরূপ আক্রমণ করিলেন। নীলাম্বর ও অসাধারণ বীরত্বের সাহত তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। বহু বৎসরব্যাপী অবরোধের পর হুশেন সা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ অধিকার করেন। এই ভাবে কামাতাপুর মুসলমান নবাবের হস্তগত হয়। এই সম্বন্ধে

একটী গল্প প্রচলিত আছে যে—নীলাম্বরের কাছে হোসেন শা পরাজিত হইলে হোসেন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার স্ত্রী নীলাম্বরের রাণীর সহিত দেখা করিতে চাহেন। নীলাম্বর সম্মতি দিলেন। হোসেন পাল্কীর মধ্যে অস্ত্রধারী সৈনিকগণকে পাঠাইয়া দিয়া নীলাম্বরের রাজপুরী অধিকার করেন। বিশ্বাসঘাতকের হাতে নীলাম্বর বন্দী হইলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হুশেনশার কামরূপ বিজয়ের কথা তেমন বিস্তারিত ভাবে কিছুই লেখেন নাই। হুশেনশা কামরূপ রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার এক পুত্রের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। নবাব এই বিজয়কে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য স্বীয় রাজধানী গৌড় বা মালদহে একটী মাদ্রাশা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মাদ্রাশার গায়ে যে খোদিত লিপি আছে (১৫০১—২ খ্রীঃ) তাহা হইতেও কামরূপ বিজয়ের কথা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

মদন ও চন্দন

এই সময়ের পরেই বোধ হয় কামরূপ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অন্যান্য ছোট ছোট রাজার মধ্যে মদন ও চন্দন নামে দুই ভাই বেশ দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর চলিয়া গেলে,পরে কোচেরা বিশ্বসিংহ নামক এক ব্যক্তির অধীনে পরিচালিত হইয়া বরনদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

কোচারি আধিপত্য—কোচ—রাজাদের কথা

নীলাম্বর রাজার পতনের পর কামরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; এই সকল রাজ্যের একটিতে কুচি বা কোচারি নামে এক জাতি বাস করিত। কালে এই কোচারি রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হইয়া উঠে। প্রথমতঃ কুচিদের পৃথক্ পৃথক্ অনেক সম্প্রদায় ছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একজন দলপতি, সর্দ্দার বা অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সর্দ্দারদের মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সর্দ্দার বা অধ্যক্ষের নাম **হাজো**। কথিত আছে যে হাজোর **হীরা** ও **জীরা** নামে দুইটী কন্যা ছিল। হাজোর এই দুই কন্যার হারিয়া মেচ, বা হারিয়া মণ্ডল নামক এক 'মেচ' সম্প্রদায়স্থ যুবকের সহিত বিবাহ হয়। হারিয়া মণ্ডল বেশ প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন, বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তঃর্ভুক্ত কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর হারিয়া মণ্ডলের প্রভুত্ব ছিল। যথাকালে জীরার চন্দন ও মদন নামে দুইটী পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরার তখনও কোন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। এজন্য তিনি সর্ব্বদা মনে মনে মহাদেবকে ডাকিতেন—মহাদেব ভিক্ষুক বেশে দেখা দিয়া তাঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন। হীরার ও যথাসময়ে শিশুসিংহ ও বিশ্বসিংহ নামে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

হাজো

চন্দন ও মদন

হাজোর পর হীরার পুত্র বিশু রাজ্যের অধিকারী হইলেন। বিশু পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। প্রথমে রংপুর এবং ক্রমশঃ পূর্ব্বে বড় নদী ও পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্ট হইতে নূতন একদল ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে "কামরূপ ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত ও আপন রাজ্যে স্থাপিত করেন। অনেক পণ্ডিত বলেন যে এই সময়েই তন্ত্রসমূহ লিখিত হয়। যোগিনীতন্ত্র এই সকল তন্ত্র মধ্যে প্রধান। বিশুসিংহ এই সময়ে বিশ্বসিংহ এই নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপনাকে একজন রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা বিশ্বসিংহ বলিতেন, তিনি স্বয়ং শিব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ও 'রাজবংশী' বা 'রাজপুত' নাম গ্রহণ করিয়াছিল। হীরার বংশধরেরা সকলেই "দেব" বা 'প্রভু' নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যিনি সিংহাসনে বসিতেন তাঁহার উপাধি হইত "নারায়ণ"। তাঁহাকে নারায়ণ নামে সম্ভাষণ করা যাইত। বিশ্বসিংহ হইতেই কোচ রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিশ্বসিংহ বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভাই শিশু রায়কত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহার শিরে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা হইবার পর ভূঁইয়াদিগকে পরাজিত করেন এবং বিজনী, বিদ্যাগ্রাম ও বিজয়পুর অধিকার করেন। শিশুসিংহ বৈকুণ্ঠপুরে সুন্দর বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন এবং তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। জলপাইগুড়ি রাজবংশের তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। এদিকে ব্রাহ্মণরাও বিশ্বসিংহকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতে

বিশ্বসিংহ

যত্নবান হইলেন, তাঁহারা প্রচার করিলেন যে পরশুরামের ভয়ে যে সকল ক্ষত্রিয়েরা উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিশ্বসিংহের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাঁহাদেরই একজন। বিশ্বসিংহ সর্ব্ববিষয়েই দক্ষ নৃপতি ছিলেন। মৈথিল ব্রাহ্মণ ও শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদের উপর গুরু-পুরোহিতের ভার অর্পণ করিলেন। নিজে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শিব-দুর্গার উপাসনায় মনো-নিবেশ করিলেন। তিনি কামাখ্যাদেবীর মন্দিরগুলি পুনরায় নির্ম্মাণ করাইলেন এবং বিষ্ণু উপাসক ও পুরোহিতদিগকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন। কামাখ্যাদেবীর পূজার জন্য কাশী ও কনৌজ হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন।

বিশ্বসিংহের হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা

বিশ্বসিংহ চিকনা গ্রাম বা চিকনা পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া কোচবিহারের সমতলক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করেন এবং একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করেন। বিশ্বসিংহ মেচ্‌দের বিভিন্ন দলের কয়েকজন সর্দ্দারকে লইয়া একটী মন্ত্রীসভা এবং ভ্রাতা শিশুসিংহ বা শিবসিংহকে প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করিলেন। বিশ্বসিংহই সর্ব্ব-প্রথমে লোক গণনা বা আদমসুমারির প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সৈন্য সামন্ত লোকসমূহের অভাব ছিল না। হাতী, ঘোড়া, গাধা, মহিষ এবং উটের সংখ্যাও তাঁহার কম ছিল না। বিশ্বসিংহ বহুবিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আঠারটী পুত্র ছিল। মল্লদেব, শুক্লধ্বজ, জয়সিংহ ও গোঁসাই কমল তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা

কথিত আছে যে শান জাতির অন্তর্নিবিষ্ট আহম জাতির সহিত বিশ্বসিংহের সংঘর্ষ হইয়াছিল,—ফল কি হইয়াছিল তাহা ভালরূপ জানা যায় না। বিশ্বসিংহ আহমদিগের রাজধানী

আক্রমণ করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। আহম জাতির ইতিহাসে আছে যে বিশ্বসিংহ একবার বন্ধুভাবে আহমদের রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন এই মাত্র।

বিশ্বসিংহ ও আহম জাতি

১৫৪০ খ্রীঃ অঃ বিশ্বসিংহের মৃত্যু হয়। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র নরসিংহ রাজা হইলেন। বিশ্বসিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় মল্লদেব ও শুক্লধ্বজ দুই ভাই কাশীতে ছিলেন। সেখানে তাঁহারা একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। শুক্লধ্বজ ও মল্লদেব পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং নরসিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নরসিংহ মোরাঙ্গ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। মোরাঙ্গের রাজা নরসিংহকে শুক্লধ্বজ ও মল্লদেবের হাতে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করায় পুনরায় তাঁহারা মোরাঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। নরসিংহ প্রথমে নেপাল পরে কাশ্মীর পলায়ন করিলেন। পরিশেষে কি হইল তাহা ভাল করিয়া জানা যায় না—কেহ কেহ বলেন যে তিনি ভূটানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

নরসিংহ

নরসিংহকে রাজ্য হইতে এইভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার পর মল্লদেব "নরনারায়ণ" নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে বসিলেন। শুক্লধ্বজ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইলেন। নরনারায়ণ বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার যত্নে ভাগবত, মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। তিনি কামাখ্যার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শুক্লধ্বজ অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন—সেনাপতির পদ পাইয়া তিনি সর্ব্বত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্লধ্বজ বহুবার আহমদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন

নরনারায়ণ

এবং রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র তাঁহার এইরূপ দ্রুতগতির জন্য সকলে তাঁহার নাম দিয়াছিল—চিলারি অর্থাৎ চিলের রাজা। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে আহমগণ সলা নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তাঁহার সময় কোচবিহার হইতে উত্তর লক্ষ্মীমপুর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল দীর্ঘ পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই রাস্তার দুইদিকে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। রাজার ভ্রাতা 'গোঁসাই কমল' এই পথ নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। এই রাস্তা 'গোহামকামুল আলি' বা গোঁসাইকমলআলি নামে পরিচিত। ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পথের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। নারায়ণপুর নামক একটী দুর্গও এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শুক্লধ্বজ অসাধারণ বীরত্ব সহকারে কাছাড়, জয়ন্তিয়া, মণিপুর ও আহম-রাজগণকে পরাজিত করিয়া কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। আহমদের রাজা শুক্লেংমুং নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কাছাড়িরা ও সহজেই নরনারায়ণের অধীনতা মানিয়া লইয়াছিলেন। খৈরামের রাজা বীর্য্যবন্ত তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং পনেরো হাজার টাকা, নয়শত স্বর্ণমুদ্রা, পঞ্চাশটি ঘোড়া এবং ত্রিশটি হাতী প্রদান করেন, বেশীর ভাগ বীর্য্যবন্ত নিজ মুদ্রায়ও নরনারায়ণের নাম অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলেন।

আহোম কাছাড়ি মণিপুর, খৈরাম প্রভৃতির পরাজয়

এই সকল রাজ্য জয়ের পর শুক্লধ্বজ বঙ্গদেশ জয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বন্দী হইয়াছিলেন, পরে কৌশলক্রমে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ত্রিপুরা-জয়ের জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।—শুক্লধ্বজ যখন এ সকল

যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মুসলমান সৈন্যগণ কামাখ্যা ও হাজোর মন্দিরাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

কালাপাহাড়ের কোচবিহার ও কামরূপ আক্রমণ

বিহারের শাসনকর্ত্তা সুলেমান্ কররাণির সেনাপতি কালাপাহাড় ১৫৬৩—১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কালাপাহাড় পূর্ব্বে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিশেষরূপে হিন্দু-বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। রাজা নরনারায়ণ কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। কালাপাহাড় কামাখ্যাদেবীর মন্দির ভগ্ন এবং পীঠস্থানবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর অন্যান্য দেবমূর্ত্তিগুলি গদাঘাতে বিকৃত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বার বৎসর কাল প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া নরনারায়ণ এই সকল ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। কামাখ্যা মন্দিরের বর্ত্তমান (চলন্তা) মূর্ত্তি (যাহা সাধারণতঃ নাড়াচাড়া করা যায়) মহারাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বর্ত্তমান কামাখ্যামন্দিরের বহির্ভাগেই মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তর-খোদিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দুইটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে ১৪০টি নরবলি প্রদত্ত হইয়াছিল।

সেখানে একটী খোদিত লিপি আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত রূপ লিখিত রহিয়াছে।—মল্লদেব (নরনারায়ণ) নৃপতি দয়া দাক্ষিণ্যে যিনি অতুলনীয়, ধনুর্বিদ্যায় যিনি অর্জ্জুনের ন্যায় দক্ষ, দানে যিনি কর্ণ ও দধীচির ন্যায় মহৎ,—সকল গুণের সাগর যিনি—সকল শাস্ত্রে পারগ যিনি, চরিত্রে যিনি অসাধারণ, সৌন্দর্য্যে যিনি কন্দর্প, সেই মল্লদেব কামাখ্যাদেবীর একজন ভক্ত। তাঁহার ভ্রাতা শুক্লদেব (শুক্লধ্বজ) ১৪৮৭শকে (১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) এই দুর্গাদেবীর মন্দির নীলাচলপর্ব্বতে নির্ম্মাণ করেন।

রঘুদেব নারায়ণ

চিলারায়ের (শুক্লধ্বজ) মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র রঘুদেব নারায়ণের সহিত নরনারায়ণের কলহ উপস্থিত হয়। ইহার একটু কারণ আছে। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুত্রক থাকায় শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ; কিন্তু পোষ্য পুত্র গ্রহণের কিছুদিন পরে তাঁহার একটী পুত্র হয়। রঘুদেব ভাবিলেন ভবিষ্যতে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিবে এজন্য তিনি নিরাশ হইয়া গোপনে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। নরনারায়ণ এই বিষয় জানিতে পারিলে রঘুদেব পলাইয়া যাইয়া পূর্ব্বাঞ্চলের শত্রুগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদের সৈন্য লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের রাজ্য আক্রমণার্থ আসিলেন। নরনারায়ণ ও স্বীয় সৈন্য সামন্ত সহ অগ্রসর হইলেন। রঘুদেব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। নরনারায়ণ ইহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ—"আমি রঘুকে রাজ্য দিবার জন্যই আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও হইল না, অতএব এই নদীই উভয়ের রাজ্য সীমা হউক।" রঘুদেবের রাজ্য সীমা—পশ্চিমে স্বর্ণকোষী ও পূর্ব্বে দিক্‌রাই আর নরনারায়ণের রাজ্যের সীমা—পূর্ব্বে স্বর্ণকোষী ও পশ্চিমে করতোয়া। রঘুদেব গোয়ালপাড়া জেলার জোয়ার পরগণার মধ্যে আধুনিক গৌরীপুর নগরের দশ মাইল দূরে গদাধর নদীর তীরে নগর স্থাপন করেন। নরনারায়ণের নিজের টাকশালও ছিল। ১১৭৭ সকে (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা এখনও পাওয়া যায়। নরনারায়ণের রাজত্ব কালেই রালফ্‌ ফিচ্‌ (Ralph Fitch) নামক একজন বিখ্যাত ইংরেজ পর্য্যাটক তাঁহার রাজ্য মধ্যে গিয়াছিলেন। রালফ্‌ ফিচ্‌ বলেন—"আমি বাঙ্গালা দেশ হইতে কোচ রাজ্যে যাই। রাজা ছিলেন হিন্দু।

তাঁর রাজ্য বেশ বড়। বাঁশ ও বেত এদেশে প্রচুর। এদেশে মৃগনাভিও পশম প্রচুর পাওয়া যায়। এদেশে কার্পাসের খুব চাষ হয়। কার্পাসের তুলা হইতে কাপড় তৈয়ারী হয়। এদেশের অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। রাজা পশুদের জন্যও হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নরনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন।" রাজা নরনায়ণের সময়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেব বহু বৈষ্ণব কবিতা ও স্তোত্র লিখিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ একখানি ব্যাকরণ এবং অনন্তকান্দলি আসামী ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করেন।

নরনারায়ণের চরিত্র

নরনারায়ণ কোচ রাজাদের মধ্যে আদর্শ নৃপতি ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তিনি ছাপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পূর্ব্বভাগ বা "কুচ হাজো" রাজ্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে দেওয়া হয়। পশ্চিম ভাগ বা কুচবিহার, তিনি আপনার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য রাখিয়া যান। পরবর্ত্তী কুচবিহারের রাজারা এই লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধর।

এ সময়ে তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ভাবে কামরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তন্ত্রের মত অতি জটিল ও বীভৎস। এই ধর্ম্ম মতে নরবলি ও অতি প্রশস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান। কামাখ্যাদেবীর মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় এক শত চল্লিশটি নরমুণ্ড দিয়া দেবীর অর্চ্চনা করা হইয়াছিল। সেকালে কামরূপে আই (Ai) ধর্ম্মাবলম্বী একদল লোক ছিলেন, তাহারা নরবলির জন্য উপযুক্তরূপে মানুষকে খাওয়াইয়া পুষ্ট করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে বলি দিত।

তাহাদের নাম ছিল 'ভোগী'। ভোগীদিগকে বলি দিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে, শত্রু কর্ত্তৃক কোচবিহার রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ তখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিরুপায় ও বিপন্ন হইয়া মানসিংহের নিকট যাইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, অধীন রাজন্যরূপে দিল্লীর সম্রাট্কে করদানে সম্মত হইলে, তাঁহাকে সাহায্য দান করা হয়। এই সময় হইতেই কোচবিহার দিল্লীর অধীন করদ রাজ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময়ে তদানীন্তন কুচবিহার-রাজ দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মিরজুম্‌লা একদল সৈন্যসহ কুচবিহারে প্রেরিত হইয়া বিদ্রোহী রাজাকে পরাস্ত করেন। ইহার পরে কুচবিহার রাজ্য একেবারে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল—এ কথা বিস্তারিত ভাবে পরে বলিব। রঘুদেব দুর্ব্বল নৃপতি ছিলেন। কালাপাহাড় যে হয়গ্রীবের মন্দির ধ্বংস করেন, রঘু তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক নরবলি ও পশুবলি দিয়া তিনি মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ করেন।

ঈশাখাঁর সহিত যুদ্ধ

রঘুরায় কামরূপ ও গোয়ালপাড়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। বর্ত্তমান কামরূপ ও মঙ্গলদই পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সেকালে রঘুর রাজত্ব ছিল। বাঙ্গালাদেশের বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠতম ভূঁইয়া খিজিরপুরের ঈশাখাঁ কামরূপ আক্রমণ করিয়া গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলায় বর্ত্তমান জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানের দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিয়া রঘু ঈশাখাঁর

সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে যাইয়া অসমর্থ হইয়াছিলেন। রঘু কোনরূপে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ একটী সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন। ঈশাখাঁ এইবারে সমুদয় কোচ রাজ্য অধিকার করেন। রাঙ্গামাটি হইতে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড ঈশাখাঁর করতলগত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা কেবল মাত্র এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুদেব ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

শঙ্করদেব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম (১৪৪৯—১৫৬৯)

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী এই সময়টা কামরূপে তন্ত্রোক্ত হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ ভাবে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। পশু-হত্যা ও নরবলি প্রভৃতির আড়ম্বরে মন্দিরগুলি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে **শঙ্করদেব** নামক একজন কায়স্থ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। শঙ্করদেব বতদ্রোব নামক গ্রামে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বতদ্রোব নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। শঙ্করদেব প্রচার করেন যে আড়ম্বর পূর্ণ জীব বলি দিয়া দেবতার পূজা কিছুই নহে,—ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং উপাসনাই হইতেছে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি প্রথম আহোম রাজ্যে গমন করেন। সেখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বশতঃ তাঁহাকে নির্য্যাতিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি মহারাজা নরনারায়ণের শান্তিপূর্ণ রাজত্বে বড়পেটা নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে যে মহারাজা নরনারায়ণ পর্য্যন্ত বহুবার শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বড়পেটাতে ধর্ম্মালোচনার জন্য একটী ছত্র স্থাপিত হইল। একে একে বহুলোক আসিয়া এই শান্তিপূর্ণ ধর্ম্ম মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি অনেক

ব্রাহ্মণ গোঁসাইরাও এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে শঙ্করদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলাপ্রিয়ার সহিত নরনারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন শুক্লধ্বজ কমলাপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। শঙ্করদেবের ধর্ম্মোপদেশগুলি কবিতার আকারে লিখিত হইয়াছিল। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়। শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর মাধবদেব নামক একজন কায়স্থ শিষ্য তাঁহার উত্তরাধিকারী রূপে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। মাধবদেব বড়পেটায় বাস করিতেন। এই সম্প্রদায় **মহাপুরুষীয়া** সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য তেমন ভাবে অগ্রসর হয় নাই। ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্মমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ব্রাহ্মনিয়া গোঁসাইদের মধ্যে দেব দামোদর, হরিদেব এবং গোপালদেব প্রধান ছিলেন। মাধবদেব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। মাধবদেব ত্যাগী পুরুষ ছিলেন এমন কি এদিক্ দিয়া তিনি সম্প্রদায়ের আদর্শ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কঠোরতা অনেকটা কমাইয়া দিয়াছিলেন। বড়পেটা এখনও মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের তীর্থ স্থান রূপে পরিচিত।

মাধবদেব

রঘুদেব নারায়ণের পরে, তাঁহার পুত্র পরীক্ষিত সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরীক্ষিতের সহিত নর নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে আহমেরা খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারা কাছাড়িদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। এদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরীক্ষিতের মধ্যেও বিশেষ অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ ও

রাজাপরীক্ষিত

পরীক্ষিত উভয়েই আহোম রাজাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষিত আহোমদের রাজা প্রতাপসিংহের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন আর লক্ষ্মীনারায়ণ আহোমরাজ বংশের এক কুমারীকে বিবাহ করিলেন। এই ভাবে তাঁহারা আহোমদের সহিত মিত্রতাবন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আহোমেরা লক্ষ্মীনারায়ণ ও পরীক্ষিতের ভিতরের এই কলহ মীমাংসার কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই কেননা আহোমেরা তখন কাছাড়িদের সহিত যুদ্ধে বিশেষ রূপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজা পরীক্ষিতের সময়ে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। তখন বাঙ্গালার গভর্ণার বা শাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁ; ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী। ইস্‌লাম খাঁ একদল সৈন্য পাঠাইয়া পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরীক্ষিত পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তিনি প্রথমে ঢাকায় বন্দী হইয়া গেলেন পরে সেখান হইতে দিল্লী প্রেরিত হন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে চারিলক্ষ টাকা উপঢৌকন দিতে স্বীকৃত হওয়ায় পরীক্ষিত মুক্তিলাভ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ হতভাগ্য পরীক্ষিত রাজধানীতে ফিরিবার পথে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। পরীক্ষিত রাজ্য রক্ষার্থ বিশেষ সাহসিকতার সহিত জলপথে এবং স্থলপথে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ধুবড়ীতে দুর্গে অবস্থান করিয়া তিনি বিশেষ বিক্রমের সহিত মুসলমানদের গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য মুসলমানের হাতে যাইয়া পড়িল। ঐ সময় হইতেই কোচরাজাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। পশ্চিমভাগ মুসলমান শাসনের অধীন হয়। পূর্ব্বভাগ আহোমেরা জয় করিয়া আপনাদের শাসনাধীনে রাখে।

এদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। আকবরনামায় লক্ষ্মীনারায়ণ সম্বন্ধে লিখিতে আছে যে তাঁহার ৪,০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ২০০,০০০, পদাতি, ৭০টী হস্তী এবং ১০০০০ জাহাজ ছিল। তাঁহার রাজ্য দৈর্ঘ্যে ২০০ শত ক্রোশ, এবং প্রস্থে কোথাও ১০০, কোথাও ৪০ ক্রোশ। পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তর সীমা তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃতছিল। ১৫৯৭ খ্রীঃ অঃ লক্ষ্মীনারায়ণ এক কন্যাকে রাজা মানসিংহের সহিত বিবাহ দেন। মানসিংহ তখন বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মানসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক সময়ে একদল সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন।

মকরম ঃ

বড়নদীর পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত কামরূপ রাজ্য মোগল সম্রাটের করতলগত হইল। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মকরম খাঁ কামরূপের শাসন-কর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তিনি রাজধানী হাজোতে লইয়া গেলেন। অনেক বড় বড় সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা এসময়ে আসামে উপনিবেশিত হন। তাঁহারা সরকার হইতে জমি জমা এবং লোক-লস্কর পাইয়া-ছিলেন। কোচেরা মুসলমানদের অধীনতাটা একেবারেই পছন্দ করিতেননা। তাঁহারা মুসলমানদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন।

বলিনারায়ণ

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিনারায়ণ আহোমরাজা প্রতাপসিংহের শরণাগত হইলেন। মুসলমানেরা এজন্য আহোম রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু মুসলমান সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া হাজোতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পশ্চিমে বড় নদী পর্য্যন্ত সমুদয় কোচরাজ্য আহোমদের অধিকারভুক্ত হইল। আহোমেরা বলিনারায়ণকে তাঁহাদের করদ নৃপতিরূপে দারবঙ্গের রাজা করিয়া দিলেন। আহোমেরা তাঁহার নাম দিলেন ধর্ম্মনারায়ণ। বহু কোচেরা ও নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহে ও বিপ্লবে পর্য্যুদস্ত হইয়া আহোমগণের অধীনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

আহোমেরা এ সময়ে চুটিয়াদিগকেও পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। চুটিয়ারা আপনাদিগকে সদিয়ার নিকটবর্ত্তী বিদর্ভের রাজা ভীষ্মকের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করেন। চুটিয়াদের প্রাচীন কথা কিংবদন্তীমূলক এবং বিবিধ অলৌকিক কাল্পনিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বীরপাল নামক একজন চুটিয়া সর্দ্দার এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সদিয়াতে চুটিয়াগণের রাজধানী ছিল। আহোমদের সহিত এই জাতির বরাবর বিবাদ চলিতেছিল। দুইশত বৎসর কালস্থায়ী ক্রমাগত কলহের পর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আহোমগণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

চুটিয়া জাতি

চুটিয়াগণ তাহাদের পুরোহিত দেওরীদের সাহায্যে কালীপূজা করিত। তাহাদের কেশাইখাতি দেবতা কাঁচামাংসাহারী, তাঁহাকে নরমাংস দিয়া পূজা করিতে হইত। আহোমদের অধিকারের প্রথম অবস্থায়ও এই চুটিয়ারা সদিয়ায় তাম্রমন্দিরে নরবলি দিতেন। তিপ্‌রা, কাচারি, কোচ, জয়ন্তিয়া এবং আসামের অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতিয় লোকেরাই সেকালে নরবলি দিয়া দেবতার পূজা করিত। চুটিয়ারাজারা পরবর্ত্তী কালে সদিয়ার নিকটবর্ত্তী বিদর্ভ নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

আহোমরাজাদের কথা

আহোম জাতি আসামে অনেক দিন রাজত্ব করেন। আসামের খাঁটি সত্য ইতিহাস আহোমদের রাজত্বকাল হইতেই জানিতে পারা যায়। আহোমদের পুরোহিতেরা আহোম রাজাদের কথা, তাহাদের রাজত্বের সময়কার বিবিধঘটনা বেশ যত্ন সহকারে লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের এই বিবরণীর নাম "বুরুঞ্জি" এই বুরুঞ্জি 'গুলির মধ্যে বেশ সতর্কতার সহিত বিশ্বস্ত ভাবে আসামের ইতিহাস লেখা আছে।

আহোমরা তাঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প বলেন। সে অনেক গল্প। তাঁহারা আপনাদের দেবতার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। আহোমেরা কামরূপে আসিবার আগে কামরূপের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত পঙ্গ বা পাংনা নামক স্থানে থাকিতেন। আহোমেরা শান জাতিরই অন্তর্নিবিষ্ট একটী সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। আহোমেরা তেজস্বী, সাহসী এবং স্বাধীন জাতি। তাঁহাদের প্রাচীন রাজ্যের নাম পঙ্গ। মোগঙ্গ বা মৌলঙ্গ ছিল তাহাদের রাজধানী। ইরাবতী নদীর উচ্চ উপত্যকায় এখনও ইহাদের এই রাজ্য বর্ত্তমান আছে। আহোমেরা আপনাদিগকে তাই (Tai) অর্থাৎ দেবতার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে আহোমেরা ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা প্রদেশের উত্তর প্রান্তে প্রবেশ করে। ক্রমে তাহারা সমস্ত উপত্যকা প্রদেশ জয় করিয়া; তাহাদের নিজ নামে সমস্ত দেশের নাম নির্দ্দেশ করে।

তাহাদের নাম অনুসারে এখন ঐ রাজ্যকে আসাম বা আহোম বলে। পঙ্গ রাজ্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পঙ্গের সিংহাসন লইয়া কয়েকজন আহোমদলপতির মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। যাঁহারা সিংহাসনের জন্য গোলমালের সৃষ্টি করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন সুকাফা। সুকাফা গৃহবিবাদে বিশেষ সুবিধা করিতে নাপারিয়া বিফল মনোরথ হইয়া আপনার দলের ৯,০০০ সম্ভ্রান্ত পুরুষ, স্ত্রী ও বালকবালিকা প্রভৃতি সঙ্গীগণের সহিত কয়েক বৎসর কাল ইরাবতী ও পাতকাই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা এই পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গের লোকেরা সকলেই বয়স্ক এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। সুকাফার সঙ্গে দুইটী হাতী এবং ৩০০ ঘোড়া ছিল। রাজ্য হইতে বাহির হইয়া প্রায় তেরো বৎসর কাল সুকাফা পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সেখানে অনেক পার্ব্বত্যজাতি বাস করিত। একে একে সকল পার্ব্বত্য জাতি তাঁহাদের বশীভূত ও অধীন হইয়া পড়ে। অবশেষে সুকাফা দলবল লইয়া খামজাং নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এসময়ে আশেপাশের অনেক ছোট ছোট প্রদেশ মোরাণ এবং ও বোরাহী নামক দুইটি স্থান পার্ব্বত্যজাতির অধিকারে ছিল। সুকাফা ইহাদিগকে পরাজিত করেন। সুকাফা এসকল ক্ষুদ্র রাজাদের এবং পার্ব্বত্য জাতিদের পরাজিত করিয়াও তাহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধু ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কোনরূপ অত্যাচার অবিচার করিলেন না এমন কি এসকল জাতির সহিত তাহাদের পরস্পরের বিবাহ

সুকাফা (১২২৮—১২৬৮)।

ইত্যাদিও চলিতে লাগিল, কাজেই কোন দিকে কোন গোলযোগ হইল না। ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুকাফার মৃত্যু হইল। সুকাফা এই ভাবে কামরূপের এক অংশে রাজ্যস্থাপন করেন। সুকাফা বেশ বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন কিন্তু তিনি নাগাদিগকে দমন করিবার জন্য কঠোর নির্য্যাতন ও নৃশংস অত্যাচার করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

আহোম ও চুটিয়া

আহোমদের সঙ্গে চুটিয়াদের ও বেশ যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। সেসময়ে চুটিয়ারা আসামে একটী সুদৃঢ় রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। চুটিয়ারা সদিয়ার প্রাচীন পাল রাজবংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহাদের দলপতি শেষ পাল রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। আহোমেরা এবং চুটিয়ারা বহু কাল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অধিকার করিয়াছিল। আহোমেরা যে সকল স্থানে শাসন করিত এখন সে সকল স্থানে লক্ষ্মীপুর জেলা ও শিবসাগরের অন্তর্গত। আহোম ও চুটিয়ারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন পক্ষই এককালে অধিকদিন পর্য্যন্ত স্বীয় ক্ষমতা চালাইতে বা আধিপত্য রক্ষা করিতে পারে নাই। অবশেষে আহোমেরা সর্ব্বতোভাবে চুটিয়াদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, তাহাদের রাজা নিহতও রাজধানী আক্রান্ত হয়। চুটিয়াগণ এই শেষ পরাজয়ের পর ফিরিয়া আর মাথা তুলিতে পারে নাই। এই সময় হইতেই সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আহোমদিগের একাধিপত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুকাফাই প্রথম অভিযানের পরিচালক ছিলেন।

সুতেফা
১২৬৮—১২৮১

সুকাফার পর তাঁহার পুত্র সুতেফা রাজা হইলেন! সুতেফা তেরো বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান

ঘটনা শান্ বা নরজাতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ। নরেরা আহোমদের জ্ঞাতিভাই হইলেও তাহাদের চেয়ে শিক্ষায় ও সভ্যতায় উন্নত ছিল। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, এবং অনেকে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এবং সুলেখক ছিলেন।

সুবিংফা ১২৮১—১২৯৩

সুতেফার পর তাঁহার পুত্র সুবিংফা রাজা হইলেন। তিনি বড় গোহেইন ও বুড়া গোহেইনের মধ্যে সমানভাবে প্রজাদের ভাগ করিয়া শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আহোমদের মধ্যে রাজার পরই গোহেইনদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল।

সুখোফা ১২৯৩—১৩৩২

এইবার রাজা হইলেন সুখাংফা। এসময়ে আহোমদের রাজ্য সীমাও যেমন বাড়িয়া গিয়াছিল তেমনি তাঁহাদের জনসংখ্যাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা জনবলে ও শক্তিবলে সর্ব্বত্র আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে যাইয়া ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আহোমেরা প্রথমটায় প্রতিবেশী কাছাড়ি কিংবা চুটিয়াদের সহিত কলহ না করিয়া কামাতার রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, উভয়পক্ষেই বহু ক্ষতি হইয়াছিল অবশেষে কামাতার রাজা যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া আহোম রাজার সহিত সন্ধি করিয়া এক কন্যার বিবাহ দেন।

সুখাংফা উনচল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার চার ছেলে ছিল। ইহারা কয়েক ভাই নানা গোলযোগের মধ্য দিয়া রাজত্ব করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বংশের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় সুদাংফা নামে একজন রাজবংশীয় বীর এই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সুদাংফা
১৩৯৭—১৪০৭

সুদাংফার বয়স যখন কেবল মাত্র পনের বৎসর তখন তিনি রাজা হইলেন। বাল্যকালে তিনি এক ব্রাহ্মণের ঘরে লালিত-পালিত ও শিক্ষালাভ করেন এইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল ব্রাহ্মণ রাজা। তাঁহার রাজত্ব কালে আসামে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সুদাংফা রাজা হইয়া শৈশবে যে ব্রাহ্মণের কাছে শিক্ষালাভ করেন তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। হিন্দু শিক্ষা সভ্যতার আলোক এই সময় হইতেই আহোম রাজ্যে প্রচলিত হইতে থাকে। হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী পূজা-পদ্ধতিও এই সময়ে প্রচলিত হয়। সুদাংফার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা তিপাস্ নামক পার্ব্বত্যজাতির বিদ্রোহ। তাহারা নূতন রাজার নূতন বিধি ব্যবস্থা মানিয়া লইতেছিলনা কাজেই ভীষণ গোলযোগেয় সৃষ্টি হইল সুদাংফা সেই বিদ্রোহীদিগকে কৌশলে দমন করিলেন। সুদাংফা আহোম রাজ্য বেশ দৃঢ় ভাবে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুদাংফা বেশ সাহসী এবং প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন, কোন কোন যুদ্ধে তিনি নিজে সৈন্যদের অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন।

সুজাংফা
১৪০৭—১৪২২
সুফাখ্ফা
১৪২২—১৪৩৯
সুসেংফা
১৪৩৯—১৪৮৮

সুদাংফার পর একে একে সুজাংফা, সুফাখ্ফা ও সুসেংফা রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনাই। সুসেংফার সময়ে আখাম্পালের নাগারা আহোমদের বশ্যতা স্বীকার করেন। সুসেংফা ৪৯ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে দেশে কোন গোলযোগ ছিলনা, দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল, প্রজারাও বেশ সুখে শান্তিতেই দিন কাটাইয়াছিলেন।

সুসেন্ফার পর তাঁহার ছেলে সুহেন্ফা রাজা হইলেন। তাংশু দলের নাগাদের সহিত এই সময় আহোমদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের

পরিচালক বড় গোহেইন্ এই যুদ্ধে নিহত হন। প্রথম অবস্থায় নাগারা আহোমদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেও শেষটায় পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে।

সুফেন্ফ
১৪৪৮—
১৪৯৩

১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়িদের সহিত আহোমদের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। দিখু নদীর তীরে দম্পূক্ নামক স্থানে আহোমেরা কাছাড়িদের কাছে পরাজিত হইলেন। বহু আহোম সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। আহোম রাজা বাধ্য হইয়া কাছাড়িদের সহিত সন্ধি করিলেন। বহু মূল্য যৌতুক, দুইটি হস্তী এবং এক রাজকন্যার সহিত কাছাড়ি রাজের বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সুহেন্ফা গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। সুহেন্ফার পর সুকিম্ ফা, সুহুংমুং প্রভৃতি অনেকে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সুহুংমুং একজন খ্যাতনামা নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজধানী হইল চরগুইয়াতে। রাজা হইয়া সুহুংমুং নাম লইলেন স্বর্গনারায়ণ। এই হিন্দু উপাধি গ্রহণ হইতেই বুঝা যাইতেছে সে সময়ে আহোম-রাজাদের মধ্যে কতটা হিন্দু প্রভাব প্রসার লাভ করিয়াছিল। সাধারণতঃ তিনি "দিঙ্গিয়ারাজা" নামে পরিচিত ছিলেন। কেননা তিনি দিহিং নদীর তীরে বাকৃতা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। নদীর বন্যা হইতে নিকটবর্ত্তী জনপদ রক্ষা করিবার জন্য তিনি সেখানে একটী বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে একদল নাগা বিদ্রোহ করে, বড় গোহেইন্ এবং বুড়া গোহেইন্ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। নাগারা পরাজিত হইয়া আহোমদের প্রভুত্ব মানিয়া লইল। এসময়ে চুটিয়া রাজা বীরনারায়ণ জলপথে প্রকাণ্ড এক

সুহুংমুং
১৪৯৭—১৫৩৯

নৌ-বহর ও সৈন্য সামন্ত লইয়া স্থহুংমুংর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। জলযুদ্ধে তাহারা আহোমদিগকে পরাজিত করিলেও স্থলযুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইল। চুটিয়াদের বহু সৈন্য-সামন্ত নিহত হইল, কাজেই বাধ্য হইয়া হটিয়া গেল। চুটিয়ারা আরও দুইবার এই ভাবে আহোমদের আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু শেষটায় সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হইলেন। এ সময়ে আহোমেরা রাজ্যের নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। চুটিয়াগণ আহোমদের দুর্গ আক্রমণ করেন কিন্তু সফলকাম হইতে না পারিয়া ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ রূপে পরাজিত হইয়া নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ে পর্ব্বতে ও বনে-জঙ্গলে পলায়ন করেন। স্থহুংমুং এই ভাবে সমস্ত চুটিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিলেন। এই পরাজয়ের পর হইতেই চির দিনের জন্য চুটিয়াদের গৌরব-গরিমা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

চুটিয়াদের পরাজয়

স্থহেন্‌ফা রাজার রাজত্বকালে আহোমেরা কাছাড়িদের কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই কাছাড়িদের পরাজয়ের পর হইতে আহোমরাজ সৈন্যবল বর্দ্ধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাছাড়ি রাজও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। তিনিও সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আহোমদের সহিত কাছাড়িদের যুদ্ধ হইল। কাছাড়িরা অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কাছাড়িরা তীর-ধনুক লইয়া বেশ সাহসের সহিত আহোমদের আক্রমণ গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইলেন। আহোমেরা পলায়নপর কাছাড়িদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কাছাড়িদের প্রায় ১৭০০ সৈনিকের

মৃতদেহ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পতিত অবস্থায় থাকিয়া তাহাদের ভীষণ পরাজয়ের পরিচয় দিয়াছিল। অতঃপর আহোমেরা মরঙ্গি নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করায় কাছাড়িদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল, এইবার কাছাড়িরা পরাজিত হইয়া দিমাপুরের দিকে পলায়ন করে। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে চুটিয়ারা পুনরায় বিদ্রোহ করিয়াছিল। শীঘ্রই এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া দিহঙ্গিয়া গোহেইন্ তাঁহার প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এবৎসরই সর্ব্বপ্রথম আহোমাধিপত্যে একজন মুসলমান সেনাপতি আসিয়া আহোম রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তুর্ব্বক্ নামে একজন মুসলমান সেনাপতি আহোমরাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্গে ১,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, বহু গোলন্দাজ সৈন্য এবং অনেক পদাতিক সৈন্য ছিল। শিঙ্গিরি নামক স্থানে আহোমদের একটী দুর্গ ছিল। মুসলমানেরা এই দুর্গের বিপরীত দিকে ছাউনি করিলেন। আহোমেরা তখন সলা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, আর এদিকে বর্ষাকালের বিবিধ অসুবিধা দেখিয়া মুসলমান সেনারা কোলিয়াচরা নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দুই তিনবার যুদ্ধে মুসলমানেরা প্রথমটা জয়লাভ করিলেও শেষটার জলযুদ্ধে তাঁহারা আহোমদের কাছে পরাজিত হইলেন। অনেক সৈন্য নিহত হইল, অবশিষ্ট—সৈন্যেরা বাঙ্গালা দেশে পলায়ন করিল।

আহোমদের রাজ্য মুসলমান আক্রমণ

সুহুংমুং অতঃপর ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাগাগণকে সর্ম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করেন। এদিকে কাছাড়ি রাজা দেতশাং পুনরায় গোল-

কাছাড়ি রাজ্যের পরিণাম

যোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা দেশাংয়ের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং রাজা স্বয়ং ও ধনশ্রী নদীর উপত্যকা ভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

দয়াং নদীর উত্তর তীর দিয়া আহোম রাজার সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়াছিল। কাছাড়িরা এই ভাবে উত্তর দিক্ দিয়া আক্রান্ত হওয়ায় পলাইতে আরম্ভ করিল। দেতশাং নিরুপায় হইয়া দেয়মারি পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু শেষটায় যখন আহোমেরা ধনশ্রী নদীর উপত্যকা ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন দেতশাং প্রথমে লেঙ্গুর নামক স্থানে পলায়ন করেন এবং শেষে তাঁহার রাজধানী দিমাপুরে প্রস্থান করিলেন। দেতশাং পলাইয়া ও রক্ষা পাইলেন না, অবশেষে ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। এই যুদ্ধের পর কাছাড়িরা আর কোন দিন আহোমদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। আহোমেরা ধনশ্রী নদীর উপত্যকায় নওগাঁ জেলার কালংনদী পর্য্যন্ত সমস্ত কাছাড়ি রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। এই যুদ্ধে আহোমেরা কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ আহোম রাজার অসাধারণ বিক্রম দেখিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং বহু উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদান করিলেন।

কোচ রাজ্য ও মণিপুর রাজ্য

মণিপুর-রাজ ও এই ভাবে আহোম রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। সুহুংমুং এই ভাবে রাজ্য বিস্তার করিয়া অধিকৃত রাজ্যগুলিকে করদ রাজ্য রূপে গ্রহণ করিলেন।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সুদক্ষ নৃপতি, পুত্র সুক্লেনাংয়ের ষড়যন্ত্রে ও ঘাতকের হস্তে স্বীয় শয়ন কক্ষে নিহত হইলেন। সুহুংমুং দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি সাহসী, উদার এবং

শাসনদক্ষ রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে আহোম রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার রাজত্ব কালে একে একে চুটিয়া কাছাড়ি ও নাগারা আহোমদের অধীন হইয়াছিল। তিনি তুর্ব্বাক্ নামক মুসলমান আক্রমণকারীকে পরাজিত করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে আহোম রাজত্বে শকাব্দার প্রচলন হয় এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। স্তুহুংমুং এর পর তৎপুত্র স্থক্লেনমাং সিংহাসনে আরোহণ করেন। মন্ত্রিগণের সাহায্যেই তিনি পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। রাজা হইবার পরেই তিনি পুনঃ পুনঃ কাছাড় রাজ্যে গমন করিয়া সেখানকার প্রজাদের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এদিকে আবার ভূঁইয়ারা কপিলী নদীর তীরে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তিনি তাহাদিগকে রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রধান ঘটনা কোচরাজ নরনারায়ণের সহিত বিরোধ। নরনারায়ণ এসময়ে বিশেষ ক্ষমাতাশালী নৃপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৫৪৬ খ্রীঃষ্টাব্দে কোচরাজ্যের প্রধান সেনাপতি রাজভ্রাতা শুক্লধজ বা চিলারি বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে অহোমদের সম্মুখীন হইলেন। কোচেরা তীর ধনু লইয়া এমন ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে তাহাদের আক্রমণে আহোম সেনাপতি বহু সৈন্যসহ নিহত হইলেন। দুইবার কোচেরা জয়ী হইলেন, কিন্তু তৃতীয় বার যুদ্ধে কোচেরা ভীষণ ভাবে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া স্থক্লেনমাং তাঁহার হৃত রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। এই যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দে আহোমগণ মহাসমারোহে "ঋক্ষভান" যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

স্থহুংমুংয়ের চরিত্র-চিত্র

শুক্লেনমাং ১৫৩৯—১৫৫২

কোচ রাজা নরনারায়ণের সহিত কলহ

১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ভীষণ ভুমিকম্প হইয়াছিল। ১৫৫২

খ্রীষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু হইল। তিনি কয়েকটি পথ প্রস্তুত এবং জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন করেন।

সুহুংমুংর পরে তাঁহার পুত্র সুখেংফা রাজা হইলেন। তিনি খোঁড়া রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একবার শিকার করিতে যাইয়া একখানা পা তাঁহার খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল, তদবধি তিনি খোঁড়া রাজা বলিয়া পরিচিত হন। রাজ্যের কয়েক জন তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় গুরুতর রূপে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কোচদের সঙ্গে আহোম রাজার যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল।

সুখেংফা
১৫৫২—১৬১১

একদল কোচ আহোম রাজ্যের একটা গ্রামে প্রবেশ করিয়া সেই গ্রামখানি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। কাছাড়িদের সঙ্গে যখন আহোমদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল সে সময়ে কোচেরা সুযোগ পাইয়া তিমু নামক একজন কোচ সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ ধরিয়া দিক্ষু নদীর মুখ পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। আহোমেরা ভীষণ বিক্রমে কোচদের এই অন্যায় আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোচেরা পিছু হটিয়া চলিল, শেষটায় আহোমেরা তাহাদের কাছে হটিয়া যাইতে লাগিলেন। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে স্বয়ং চিলারি রাজা বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। আহোমরাজ নিরুপায় হইয়া কামরূপের অন্তর্গত চরাইখোরঙ্গ নামক স্থানে মন্ত্রিগণের সহিত পলায়ন করেন। কোচসৈন্যেরা সুযোগ পাইয়া গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন এবং অধিবাসীদিগকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিবার পর চিলারি আহোমদের রাজধানী গরগাঁওয়ে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। তিন মাস

কোচদের নূতন আক্রমণ
১৫৬২

পরে আহোমদের সহিত কোচদের সন্ধি সংস্থাপিত হইল। কোচগণ আহোমদের অধীনতা মানিয়া লইলেন। এইরূপ বহুবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির পর উভয় রাজার মধ্যে বিবাহ-সূত্রে ঐক্য সংস্থাপিত হইল।

সুখেংফা ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল কিন্তু সবগুলি ষড়যন্ত্র সময়ে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল' সুখাংফা বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি শিকার-প্রিয় ছিলেন, হাতী ধরিবার খেদার সময় নিজেই উপস্থিত হইতেন। রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল, কিন্তু এবিষয়ে তিনি ভাগ্যবান্ ছিলেন না। শোনাপুরে যে রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন তাহা ঝঞ্ঝাঘাতে ধ্বংস হইয়া যায়, সলা খাতালি নামক স্থানের প্রাসাদটি অগ্নিতে দগ্ধ হয়, আর একটী ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বে প্রজাদের অনিষ্টজনক দুইটি ভীষণ দৈবদুর্ঘটনা ঘটে একটী ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পঙ্গপালের ভয়ানক উৎপাত, দ্বিতীয়টি ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভয়ানক বন্যা।

এসময়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের শিষ্যগণ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিল। নানাস্থানে এসম্প্রদায় 'ছত্র' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজ্যের জনসাধারণ এমন কি অনেক রাজপুরুষ ও মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। আহোম রাজাদের মধ্যে আরও অনেকে বেশ কৃতিত্বের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা পরে বলিতেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আহোম রাজাদের উন্নতির যুগ ও শাসন বিধি

সুখেংফার রাজত্বকালে দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট্ আক্‌বর অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুখেংফা বহু হিন্দুদেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে সকল মান্দরের মধ্যে মহেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণ যাজক নিয়োগ করেন এবং হিন্দুধর্ম্মকেই রাজধর্ম্মে পরিণত করিয়া লন। শৈব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

প্রতাপসিংহ
১৬০৩—১৬৪১

সুখেংফার পর সুসেংফা বা প্রতাপসিংহ রাজা হইলেন। ইঁহার রাজত্ব কালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা কাছাড়িদের সহিত যুদ্ধ। রাজা হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি কাছাড়িরাজ্য আক্রমণ করেন। এসময়ের কোচরাজ্যের সেনাপতি বিদ্রোহী হওয়ায় কোচরাজা পরীক্ষিত, আহোম রাজার শরণাপন্ন হইলেন। ওদিকে মুসলমানেরা কোচরাজ্য আক্রমণ করিল। তখন আহোমরাজা কোচরাজ্যের সাহায্যার্থ ভরলী নদীর মোহনায় মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ-জয়ের পর প্রতাপসিংহ বিশেষ আনন্দের সহিত রাজ্য মধ্যে “ঋক্ষভান” যজ্ঞ করেন। কোচরাজ পরীক্ষিত প্রতাপসিংহের এইরূপ সহায়তায় সন্তুষ্ট হইয়া—তাঁহার এক কন্যার সহিত প্রতাপসিংহের বিবাহ দিলেন। জামাতাকে উপঢৌকন স্বরূপ তেইশটি হাতীও পাঠাইয়াছিলেন।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচনৃপতি পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিনারায়ণ

মুসলমানদের কাছে পরাজিত হইয়া প্রতাপসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হইলেন। বলিনারায়ণ আহোমদের করদ নৃপতিরূপে গৃহীত হইলেন। তাঁহার উপাধি হইল ধর্ম্মনারায়ণ। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে দারঙ্গের কাছাকাছি তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপসিংহ ধর্ম্মনারায়ণ ও অন্যান্য সৈন্য সামন্ত লইয়া হাজোরদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজারা এই সময়ে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দিমারোয় রাজার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে দিমারার রাজাদের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতেছি। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পান্থেশ্বর প্রথমতঃ কাছাড়ি রাজার করদনৃপতি ছিলেন। কাছাড়ি রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ইনি নরনারায়ণের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। নরনারায়ণ তাঁহাকে জয়ন্তিয়ার প্রান্তদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, সেখানকার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮,০০০। পান্থেশ্বরের পুত্র চক্রধ্বজ নিয়মিত ভাবে কোচরাজাদিগকে কর প্রদান না করায় কারারুদ্ধ হন। রঘুদেবনারায়ণ ইঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। চক্রধ্বজের বংশধরেরা, যথাক্রমে পোয়ালসিংহ, রত্নাকর, প্রভাকর সকলেই রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতকে রাজস্ব দিয়া আসিতেছিলেন। জয়ন্তিয়ার রাজা ধনমাণিক প্রভাকরকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া কোচরাজাকে রাজস্ব দেওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভাকরকে জয়ন্তিয়াপুরে বন্দী করেন। প্রভাকর—কাছাড়ি রাজার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কাছাড়ি নৃপতি তাঁহাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ধনমাণিককে বলিয়া পাঠাইলেন,

মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ

কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না! কাছাড়ি রাজা জয়ন্তিয়ার রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। প্রভাকরের পুত্র মঙ্গল নানাদিকের এইরূপ বিপদ দেখিয়া আহোম-রাজার শরণপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার এই ব্যবস্থাটা সবদিক্ দিয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছিল, নচেৎ তাঁহাকে কাছাড়ি রাজা ভীমবলের কবলে পড়িতে হইত।

প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক মুসলমানদের আক্রমণ ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে

এই সকল বিভিন্ন রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রতাপসিংহ মুসলমানদের নিকট হইতে পাণ্ডু অধিকার করিলেন। মুসলমানেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হাজোতে ফিরিয়া গেল। মুসলমান সেনাপতি আবদুস্ সালাম এই পরাজয়ের কথা ঢাকার নবাবকে জানাইয়া সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ঢাকা হইতে মহিউদ্দীন নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ এক হাজার অশ্বারোহী সেনা, বহুপদাতি সৈনিক, দুই হাজার রণতরী ও বহু যুদ্ধের স্লুপ লইয়া আসিলেন। প্রথম অবস্থায় মুসলমানেরা জয়ী হইতেছিলেন এমন কি ধর্ম্মনারায়ণের দুর্গ পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন, কিন্তু শেষটায় মুসলমানেরা পরাজিত হইলেন। তাহারা দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন! মুসলমানদের রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত দশটি কামান, পঞ্চাশটি বন্দুক এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া, গরু, মহিষ খাদ্য দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে আহোমদের হাতে পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধ-জয়ের পর ধর্ম্মনারায়ণ এবং সীমান্ত প্রদেশের বহু প্রধান সর্দ্দারেরা দিমারৌয়া এবং হোজাইর রাজা বা সর্দ্দারেরা প্রতাপসিংহের আনুগত্য স্বীকার করেন। এসময়ে কালিয়াচরের শাসনকর্ত্তা বা বড় ফুকনের শঠতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানদের সহিত সন্ধি সংঘটনে নানারূপ অশান্তির কারণ ঘটে। অবশেষে উভয় পক্ষে

সন্ধি হইয়াছিল।—এই সন্ধি কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় আহোমদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধের কারণ এই যে—ইস্‌মাইলখাঁ যখন ঢাকার নবাব সে সময়ে হরিকেশ নামক একব্যক্তি নবাবের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আহোমরাজার শরণাপন্ন হন। নবাব হরিকেশকে অর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আহোম রাজা নবাবকে জানাইয়া দেন যে এইরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে মুসলমানদের নিকট হইতেও পাওয়া গিয়াছে, অতএব তিনি কোনরূপেই হরিকেশকে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন না। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হরিকেশকে জোর করিয়া ধরিয়া লইবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভরলী নদীর তীরে আবার ভীষণ রণভেরী বাজিয়া উঠিল। যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হইলেন। তাঁহাদের ৩৬০টি কামান, বন্দুক ও রসদ আহোমদের হস্তগত হইল। এইরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও মুসলমানেরা আহোমদের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই,—১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ঢাকার নবাব ক্রমাগত সৈন্য সামন্ত কামান-বন্দুক যুদ্ধের স্লুপ নৌকা, প্রচুর পরিমাণে রসদ ও অর্থ প্রেরণ করিয়াও আহোমদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই। অবশেষে আহোম রাজাদের সহিত মুসলমানদের উভয় রাজ্যের সীমা রেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সন্ধি সংস্থাপিত করিলেন।

মুসলমানদের সহিত সন্ধি ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপসিংহের মৃত্যু হইল। দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করেন। প্রতাপসিংহ সাহসী, নির্ভীক এবং ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। একদিকে যেমন মুসলমানদের সহিত, কাছাড়িদের সহিত এবং সীমান্ত প্রদেশবর্ত্তী রাজা ও সর্দ্দারদের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-

প্রতাপসিংহের মৃত্যু, ও চরিত্র আলোচনা

বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তেমনি আবার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকেও তাঁহার একান্ত আগ্রহ ও যত্ন ছিল। তিনি রাজ্যমধ্যে বহু পথ প্রস্তুত করেন, সেতু নির্ম্মাণ করেন ও বাঁধ তৈয়ার করিয়াছিলেন। তাঁহার খনিত বহু দীঘি-সরোবর এখনও বিদ্যমান থাকিয়া এই মহিমান্বিত নৃপতির কীর্ত্তি-গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

প্রতাপসিংহই সর্ব্বপ্রথম প্রজাগণনা বা আদম-সুমারির প্রচলন করেন। কাছাড়ি রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য তিনি অভয়াপুর, দিহিং এবং নামডাং হইতে বহু আহোমদিগকে মরাঙ্গ প্রদেশে উপনিবেশিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশ্রেণীর শিল্পীগণকে তিনি রাজ্য মধ্যে সমাদরের সহিত বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অভয়াপুর, মথুরাপুর প্রভৃতি নগরী নির্ম্মাণ করেন। গরগাঁওয়ের রাজপ্রাসাদের চারিদিকে পরিখা খনন করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে আকা, নাগা, দাফ্‌লা, মিরি প্রভৃতি পাহাড়িয়া জাতির লোকেরা আসিয়া সমতলবাসী প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিত।—তাহাদের এইরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপসিংহ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—তাহাদের আসিবার পথে ঘাঁটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কোন পার্ব্বত্য জাতি আহোম নৃপতির রক্ষিত প্রহরীর অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত ঘাঁটি পার হইয়া জনপদে প্রবেশ করিতে পারিত না।—বহুস্থানে তিনি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দারিকা নদীর উপর একটী প্রস্তর সেতুও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা যুদ্ধে তীরধনু এবং বন্দুক ব্যবহার করিত। নৌ-যুদ্ধে তাঁহার সৈনিকেরা বিশেষ দক্ষ ছিল।

অন্যান্য আহোম নৃপতিদের ন্যায় প্রতাপসিংহও 'খেদা' দেখিতে

ভালবাসিতেন।—শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে ছিল তাঁহার বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।—বিচার বিষয়ে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ছিল সর্ব্ববাদী-সম্মত। অতি বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও একবার তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলে রক্ষা থাকিত না। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ উদারতা ছিল। বহু দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের লোকেরা এসময়ে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় রাজা মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ের বহু গোঁসাইকে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। আহোম ভাষাই রাজভাষারূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার রাজত্ব কালে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার ভীষণ ভাবে একটা খুব বড় রকমের গো-মড়ক দেখা দিয়াছিল। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে একদল পঙ্গপাল কর্ত্তৃক প্রচুর শস্য হানি ঘটে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এযুগের আহোমদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—“আহোমেরা মাথার চুল কামাইয়া ফেলে এবং দাড়ি ছোট করিয়া ছাটে। জলে ও স্থলের এমন জন্তু নাই যাহার মাংস তাহারা না খায়। সর্দ্দার বা প্রধান ব্যক্তিরা হাতীতে ও ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করেন। পদাতিক সৈন্য ব্যতীত রাজ্যে অপর কোনও সৈনিক সম্প্রদায় নাই। ইহাদের রণতরীগুলি সুগঠিত ও সুসজ্জিত। ইহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য খুব তাড়াতাড়ি বাঁশ ও মাটিদিয়া দেয়াল গাঁথিয়া কেল্লা তৈয়ার করিতে পারে। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিখা নির্ম্মাণ করে।”

প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর রাজা হইলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র

সুরাম্পা। সুরাম্পা চরিত্রহীন, চঞ্চল চিত্ত এবং অযোগ্য নৃপতি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রহীনতার জন্য হটকারিতার জন্য এবং বিবিধ অত্যাচারের দরুণ রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুতাম্পাকে রাজ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। সুতাম্পা বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরাম্পা ভয়ে পলাইয়া গেলেন—এজন্য তাঁহার নাম হইল ভাগারাজা। এইবার সুতাম্পা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

সুতাম্পা বানারিয়া রাজা ১৬৪৪-৪৮

সুতাম্পার রাজত্ব কাল তেমন ঘটনা পূর্ণ নহে। তাঁহার রাজত্ব কালে পার্ব্বত্য দাফ্‌লাজাতির সহিত একটা গোলযোগ হইয়াছিল। তিনি দাফ্‌লাদিগকে দমন করেন। সুতাম্পার পর তাঁহার পুত্র সুতান্‌ফা "জয়ধ্বজসিংহ" এই হিন্দু উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এই সময় হইতে পরবর্ত্তী সমস্ত আহোমরাজগণই আহোম ও হিন্দু উভয়বিধ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ধ্বজসিংহের অভিষেক-উৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল। পশুর লড়াই, তোপ-দাগা, ব্রাহ্মণদিগকে ধনরত্নাদি ও দেবোত্তর ভূমি দান করিয়া রাজ্য মধ্যে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। দাফ্‌লা, কাছাড়ি ও গৌহাটির মুসলমান শাসনকর্ত্তা সকলেই জয়ধ্বজের নিকট বিবিধ উপহার পাঠাইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দুইবার নাগাদের বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। নাগা ও মিকিরজাতি অধীনতা স্বীকার করে এবং রীতিমত কর দিতে থাকে।

জয়ধ্বজসিংহ ১৬১৮-১৬৬৩

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ শাহাজাহান্ পীড়িত হইয়া পড়ায় মুসলমানদিগের মধ্যে একটা অশান্তিরও গোলযোগের সৃষ্টি হয়,

সেই সুযোগে জয়ধ্বজ মুসলমানদিগকে কামরূপ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য গৌহাটি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মুসলমান ফৌজদার আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই নৌকাযোগে ঢাকা পলায়ন করিলেন। কামান, বন্দুক, ঘোড়া ইত্যাদি অনেক জিনিষ আহোমদের হাতে পড়িল। কোচরাজা প্রাণনারায়ণ এ সময়ে সুযোগ পাইয়া মুসলমানদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আহোম রাজাদের কাছে মাথা তুলিত সাহসী হন নাই। আহোমেরা এইরূপ জয়ে এতদূর উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন যে তাঁহারা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপর প্রভুত্ব করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহারা ঢাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

সম্রাট্ শাহজাহানের মৃত্যুর পর শাহসুজার আরাকানে পলায়নের পর মীরজুম্‌লা যখন বাঙ্গালার নবাব হইয়া আসিলেন, তখন জয়ধ্বজ সংবাদ পাঠাইলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রদেশ তিনি অধিকার করিতে ইচ্ছুক নহেন, কোচদের হাত হইতে উহা রক্ষা করিবার জন্যই কেবল যুদ্ধ করিয়াছিলেন! মীরজুম্‌লা আহোম-রাজের কথায় রসিদ খাঁন নামক একজন সেনাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া দিলেন। আহোমেরা ধুবড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু শেষটায় আহোমদের সহিত মীরজুমলার যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মীরজুমলা স্বয়ং বিপুল রণ-বাহিনী লইয়া আসামের দিকে-অগ্রসর হইলেন। মীরজুমলা কোচবিহার অধিকার করিলেন। কোচবিহারের রাজা প্রাণভয়ে ভুটান পলাইয়া গেলেন। রসিদখান রাঙ্গামাটির কেল্লা হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। মীরজুমলা বারোহাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ত্রিশহাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া গভীর বন-জঙ্গল, পার্ব্বত্য-নদ-নদী উত্তীর্ণ

মীরজুম্‌লার আসাম-অভিযান

যোগী গোঁফায় অধিকার

হইয়া বহু ক্লেশে যোগী গোঁফায় আসিয়া পৌঁছিলেন। দৈনিক চার পাঁচমাইলের বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সৈন্যদের মধ্যে ওলাউঠা, এবং অন্যান্য বিবিধ পীড়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়াও মীরজুম্‌লা আহোম রাজধানী গড়-গাঁও অধিকার করিলেন। মুসলমানসৈনিকেরা শ্রীঘাটদুর্গ ও গৌহাটি দখল করিল। শিম্‌লাগড়ের দুর্গ অধিকার করিবার সময় আহোম সৈন্যেরা বারুদ ও গোলা নষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। জয়ধ্বজ নামরূপ পলায়ন করিলেন। আহোম রাজধানী অধিকার করিবার পর মীরজুম্‌লা নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করিলেন। মীরজুমলা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে বর্ষাটা কাটাইয়া দিয়া পরে ঢাকায় ফিরিয়া যাইবেন কিন্তু বর্ষাটা কিছু আগেই আরম্ভ হইয়া গেল। ক্রমাগত বৃষ্টি বাদল চলিতে লাগিল। মুসলমান সৈনিকেরা বৃষ্টির দরুণ বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃষ্টির দরুণ খাদ্য দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইল। মীর মর্ত্তুজা নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ একদল সৈন্য ঢাকায় প্রেরিত হইল। বৃষ্টিটা থামিয়া গেলে দেশে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিবার সময় মীরজুম্‌লা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন আহোম রাজের সহিত বাধ্য হইয়া নিম্নলিখিত রূপে সন্ধি হইয়া গেল। জয়ধ্বজ সিংহ তাঁহার এক কন্যাকে দিল্লীর হারেমে (রাজঅন্তঃপুরে) প্রেরণ করিলেন। বিশহাজারতোলা সোনা ইহার ছয়গুণ পরিমাণ রূপা এবং চল্লিশটি হাতী দিতে হইবে। এইরূপ আরও কয়েটি সর্ত্ত ছিল। এইভাবে সন্ধি শেষ করিয়া মীরজুম্‌লা ফিরিয়া চলিলেন। তিনি পাল্কী ও নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কাজলি নামক স্থানে ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি ও ভূমিকম্পে তাহাদিগকে

ায়ের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ
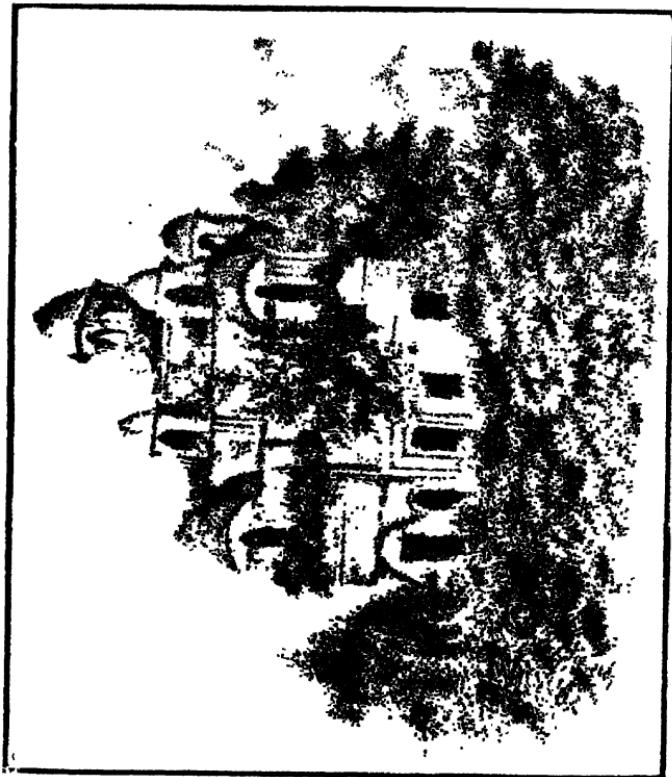
বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এ স্থানে মীরজুম্‌লা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। ঢাকা পৌঁছিবার পূর্ব্বে. ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে মীরজুম্‌লার পথিমধ্যেই মৃত্যু ঘটে। মীরজুম্‌লা চলিয়া যাইবার একবৎসর পরে জয়ধ্বজ রাজারও ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইল। এই মুসলমান-অভিযানের জন্য তাঁহাকে যে দারুণ ক্লেশ, অশান্তি ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। জয়ধ্বজ ব্রাহ্মণদের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে যুদ্ধ-বিগ্রহের দারুণ অশান্তির জন্য জনহিতকর কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। মীরজুম্‌লার এই অভিযানে তাঁহার সহিত সাহেবুদ্দীন্ নামক একজন লেখক সঙ্গীরূপে গিয়াছিলেন তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতেই এই অভিযানের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। এই মুসলমান লেখক তৎকালীন আসামের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—"আসাম দেশটি বনজঙ্গলে ভরা বিশেষ ভয়সঙ্কুল। গৌহাটি হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য হইবে দুইশত ক্রোশ। প্রশস্ততায় গারো, মিরি, মিশ্‌মি, দাফ্‌লা, নাগা প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া যাইতে একসপ্তাহের বেশি সময় লাগে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারের ভূমিখণ্ডের উত্তর কূল বা কোল এবং দক্ষিণ তীর দক্ষিণ কূল বা কোল নামে পরিচিত। কালিয়াচর হইতে রাজধানী গড়গাঁও পর্য্যন্ত পথের দুইধারে ফুল ও ফলের বাগান। আম গাছের সারি এবং বাঁশের ঝাড় দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের কৃষকেরা ক্ষেতগুলি এমন সমতল ভাবে প্রস্তুত করে যে সুদূর দিগন্তসীমা পর্য্যন্ত কোথাও সামান্য উচ্চতা ও দেখিতে পাইবে না। এদেশের জলবায়ু কোথাও বেশ ভাল কোথাও অত্যন্ত মন্দ, বিদেশীর পক্ষে তাহা সহ্যকরা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

পাহাড়ে ও সমতল ভূমিতে নানা জাতিয় গাছপালা দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর। অতি অল্প শ্রমেই বিবিধ ফসল উৎপন্ন হয়। তারপর এই লেখক একে একে দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজধানী,ও রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আসামের রাজা ও অধিবাসীরা যে বরাবর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন সে কথাই লেখক বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

জয়ধ্বজ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একজন আত্মীয়কে রাজা করা হইল। ইনি উপাধি গ্রহণ করিলেন চক্রধ্বজ। চক্রধ্বজের অভিষেক কালে ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার অভিষেকে দরঙ্গের কোচরাজ এবং জয়ন্তিয়ার রাজা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। চক্রধ্বজ সিংহ মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কেননা মুসলমানগণ প্রতিশ্রুতি মত আহোম বন্দীগণকে মুক্তি দেন নাই এবং রাজ্য সীমা লইয়াও গোলমাল করিতেছিলেন। গৌহাটির ফৌজদার রসিদ খাঁ কর ও হস্তী চাহিয়া লোক পাঠাইলে চক্রধ্বজ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এ সময়ে নাগা, মিকির ও দাফলাগণ চুটিয়াদের সহিত মিলিত হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলে—আহোম রাজ তাহাদিগকে পরাজিত ও অনেককে বন্দী করিয়াছিলেন।

চক্রধ্বজ সিংহ
১৬৬৩—১৬৮৯

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আসামের পক্ষে ভয়ানক দুর্বৎসর। এ বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ জলাভাবে ক্ষেতে ফসল জন্মিল না প্রজাগণ বহু কষ্টে কূপ খনন করিয়া পানীয় জল সংগ্রহ করিয়াছিল।

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে
অনাবৃষ্টি ও
দুর্ভিক্ষ

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ খাঁ, রসিদ খাঁর পর থানাদার হইয়া আসেন। ফিরোজ খাঁ—আহোম রাজের নিকট প্রাপ্য কর ও হস্তীর জন্য দাবী করিয়া এক কড়া চিঠি লিখিলেন। চক্রধ্বজ—ফিরোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হইলেন। গৌহাটি ও পাণ্ডুয়া আহোম অধিকারে আসিল। কামান, বন্দুক, বন্দী এবং বহু ধন রত্ন রাজধানী গড়গাঁয়ে প্রেরিত হইল। শিলঘাটে একটী পুরাণো কামান আছে, সেই কামানের গায়ে যে খোদিত লিপি আছে তাহা এইরূপ—"রাজা চক্রধ্বজ ১৫৮৯ শকে মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া এই কামানটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার রণ-গৌরব বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় আক্রমণে ফিরোজ খাঁ পরাজিত ও বন্দী হইয়া গড়গাঁয়ে প্রেরিত হন। গৌহাটিতে বড় ফুকন্ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পাণ্ডু ও শ্রীঘটের দুর্গ বিশেষ ভাবে সংস্কৃত হইল। এবং বিশেষ ভাবে রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করা হইল। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ খাঁর এই পরাজয়ের বার্ত্তা দিল্লীশ্বর আলমগীরের নিকট পৌঁছিলে তিনি রাজা রামসিংহের অধীনে বহু সৈন্য সামন্ত দিয়া কামরূপ জয় করিতে পাঠাইয়া দিলেন। গৌহাটির ভূতপূর্ব্ব ফৌজদার রসিদ খাঁও আসিলেন। স্থলযুদ্ধে আহোমেরা মুসলমানদের সহিত না পারিলেও তেজপুরের নিকট নৌ-যুদ্ধে (জল-যুদ্ধে) মুসলমানগণ পরাজিত হইলেন। অতঃপর রামসিংহ ও চক্রধ্বজের মধ্যে সন্ধি হইল। আহোমেরাও বার বার যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে চক্রধ্বজের মৃত্যু হইল।—চক্রধ্বজ অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত থাকায় রাজ্যের কল্যাণজনক তেমন কোনও কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ফিরোজ খাঁ
১৬৬৭

একটী মাত্র রাজপথ নির্ম্মাণ করেন এই মাত্র। তাঁহার সময়ে একবার দেশের জমির পরিমাপ এবং লোক গণনা (আদম স্নুমারি) হইয়াছিল।

উদয়াদিত্য ১৬৬৭ ১৬৭৩

চক্রধ্বজের ভ্রাতা স্থন্যফা উদয়াদিত্য এই হিন্দু উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজা হইলেন। উদয়াদিত্য রাজা হইয়াই মুসলমানদের সহিত সন্ধি করিলেন। রামসিংহের কাছে আহোম রাজের এই বন্ধুত্ব কপট বলিয়া বোধ হইল কাজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। একটা জল যুদ্ধে রামসিংহ পরাজিত হইয়া রাঙ্গামাটিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গোয়ালপাড়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত আহোম অধিকার বিস্তৃত হইল। এ সময়ে দাফ্‌লাগণ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

দাফ্‌লা বিদ্রোহ

উদয়াদিত্যের তাহাদিগকে দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বড় বড়ুয়া দাফ্‌লাদিগকে দমন করিতে পাহাড়ে-পর্ব্বতে ও বনে-জঙ্গলে বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উদয়াদিত্য বাহুবলে কামরূপে মুসলমানদের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। গৌহাটির চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

উদয়াদিত্যের মৃত্যু

দাফ্‌লা বিদ্রোহ এবং মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ অপসারিত হইলে যে সকল রাজ্যের সর্দ্দার এবং প্রধান ব্যক্তি মুসলমানদের সহিত যোগদান করিয়া রাজ্যের বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন—তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধানে **চক্রপাণি** নামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক শঙ্করদেবের একজন বংশধরকেও এইরূপ রাজদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে পাওয়া গেল। উদয়াদিত্য এই

লোকটির অসাধারণ মনীষা এবং পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়াছিলেন কাজেই সংবাদ পাঠাইলেন যে চক্রপাণি রাজার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলে রাজা তাঁহাকে কিছুই বলিবেন না। চক্রপাণি এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া রাজার নিকট আসিলেন, রাজা তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিয়া এতদুর প্রীতিলাভ করিলেন যে উদয়াদিত্য তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকেও চক্রপাণির শিষ্য হইতে বাধ্য করিলেন। রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি রাজার এইরূপ ব্যবহারটা পছন্দ করিলেন না, তাঁহারা রাজার ছোট ভাই রামধ্বজকে হস্তগত করিয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার কাণে কথাটা যাইয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইলনা—তিনি রাজ্যের তোরণদ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন—ভ্রাতা রামধ্বজকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। রামধ্বজ ও তাঁহার দলের লোকেরা গভীর রাত্রিতে কোনও সুযোগে একটী তোরণ দ্বার ভাঙ্গিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রাজাকে বন্দী করিলেন। বড় বড়ুয়া প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি যাহারা রামধ্বজের সহিত যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাদিগকে হত্যা করা হইল। প্রজারা রামধ্বজকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পরদিন উদয়াদিত্যকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করা হইল। উদয়াদিত্যের রাণী তিনজনকেও হত্যা করা হইল। চক্রপাণি, যাহার জন্য এত বড় অশান্তি ও একটা বিপর্য্যয় ঘটিল কোন রকমে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

আহোমেরা উদয়াদিত্যের রাজত্বকালে নানাদিক্ দিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে আহোমেরা কামান পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন। গৌহাটির ডেপুটি কমিশনারের কুঠির ভিতর সে সময়কার নির্ম্মিত একটী কামান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কামানের গায়ে লিখিত আছে যে ১৫৯৪ শকে ইংরেজী ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ষোলধর বরুয়া, উদয়াদিত্যের রাজত্ব-কালে এই কামানটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রামধ্বজ
১৬৭৩—১৬৭৫

রামধ্বজ ভ্রাতৃহত্যা দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। মিশ্‌মী ও চুটিয়াদিগকে তিনি দমন করেন। রামধ্বজ কিছুদিন পরেই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন, সে সময়ে উত্তরাধি-কারিগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। বড় বড়ুয়াকে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে বিষপান করাইয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তখন প্রজাগণের অভিপ্রায় অনুসারে নামরূপের রাজকুমার সুবিংফাকে রাজা করা হইল। সুবিংফা মাত্র এক মাস কাল রাজত্ব করেন, ইতিমধ্যেই প্রজাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে—তিনি গড়গাঁও অভিমুখে পলাইবার সময় পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন।

সুদাইফা
১৬৭৭—১৬৭৯

সুদাইফা প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইলেন। সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি "ঋক্ষভান" যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের বিষময় পরিণাম দেখিতে পাইয়া তিনি বড় গোহেইনের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহাতেও প্রজাগণের তৃপ্তির কারণ হইল না। বড় ফুকান্ গোপনে বঙ্গের নবাবকে কামরূপ আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। সুদাইফা এই সংবাদ পাইয়া গৌহাটীতে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন,

কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই বড়ফুকান্ মুসলমানদের হাতে গৌহাটির শাসনভার অর্পণ করেন। বড় গোহেইনের প্রভুত্বটা অনেকেই পছন্দ করিলেন না—প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিল। যুবরাজ ও বিদ্রোহীগণের হস্তে নিহত হইলেন। সুদাইফার প্রধান কীর্ত্তি কামরূপের কমলপুরের সেতু। এই সেতুটি তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

লড়া রাজা
১৬৭৯—১৬৮১

লড়া রাজা (বালক রাজা) মাত্র দুই বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। লড়া রাজা নৃশংস হত্যা দ্বারা পূর্ব্বতন রাজবংশের সকলকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য বহু ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন। কেবল পারেন নাই—গদাপাণি নামক একজনকে। গদাপাণি একটী গারো রমণীর গৃহে ছদ্মবেশে সাধারণ কৃষকের মত বাস করিতেছিলেন। মাঠে গরু চরাইতেন—কদন্ন ভোজন করিতেন এবং সাধারণ গারোদের মত জীবন যাপন করিতেন। লড়া রাজার দুর্ব্যবহার ও রাজ্য শাসন করিবার অযোগ্যতার পরিণাম শীঘ্রই ফলিল,—শেষটায় তাঁহাকে রাজ্যের ষড়যন্ত্রকারীদের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল।

গদাধর সিংহ
১৬৮১—১৬৯৬

লড়া রাজার পর গদাধর সিংহ রাজা হইলেন। রাজা হইয়া গদাপাণি হিন্দুনাম গদাধর সিংহ এবং আহোম নাম সুফালা গ্রহণ করেন। গদাধর রাজা হইয়াই গৌহাটি হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করেন। তিনি রাজধানী বর্কোলায় পরিবর্ত্তিত করেন। মুসলমানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি তাহাদের বহু রণতরী হস্তগত করেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহু হস্তী গৌহাটিতে আনীত হইয়াছিল। মনাস নদী আহোম ও মুসলমান রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট

গদাধর সিংহ
১৬৮১—১৬৯৬

হইল। ষড়যন্ত্রকারী বড় ফুকান্ ও মুসলমান রাজদূত নিহত হইলেন। ডিকিং ও লক্ষীমপুরের ডেপুটি কমিশনারের বাসগৃহের সম্মুখে দুইটী কামান এবং কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত কামান, এই তিনটি কামান গদাধর সিংহের মুসলমান বিজয়ের সাক্ষী দিতেছে। ঐ কামানের গায়ে খোদিত আছে রাজা গদাধর সিংহ গৌহাটি হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই কামান তিনটি পাইয়াছেন। ১৬০৪ শক (১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ)

মিরি ও নাগাদের বিদ্রোহ

১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিরি ও নাগা প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য মধ্যে বিবিধ অত্যাচার করিলে গদাধর সিংহ তাহাদের নিবারণের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে মিরিদের বাসভূমি পর্য্যন্ত এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আক্রমণকারী নাগা সর্দ্দারেরা নিহত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব গোঁসাইদের উৎপীড়ন

এ সময়ে সর্ব্বত্র বৈষ্ণব গোঁসাইরা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিষ্য-সেবকের অবধি ছিলনা। দেশের সর্ব্বত্র ইহাঁদের অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বৈষ্ণব গোঁসাইদের প্রভাব বশতঃ প্রজা সাধারণের মধ্যে অনেকেই মাছ,মাংস ইত্যাদি খাওয়া পরিত্যাগ করিতেছিল। গদাধর দেখিলেন এই ভাবে প্রজারা সকলেই বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়া গেলে দেশের লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে এবং দৈহিক শক্তির হ্রাস হইবে এই সব কারণে তিনি বৈষ্ণব গোঁসাইদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোঁসাইদের উপর তাঁহার ক্রোধের আর একটা কারণও ছিল— গদাধর যখন ছদ্মবেশে ছিলেন সে সময়ে গোঁসাইদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে আশ্রয় পর্য্যন্ত দেন নাই। এজন্য তিনি অনেক প্রধান প্রধান গোঁসাইকে ভীষণভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গদাধর সিংহের মৃত্যু হয়। নানারূপ বিপদ, অশান্তি ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া গদাধর সিংহকে রাজ্য শাসন করিতে হইয়াছিল। রাজা হইয়া তিনি প্রজাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, অন্তর্বিদ্রোহ দমন করেন এবং মুসলমানদিগকে আসামের সীমা হইতে বিতাড়িত করেন। গদাধর সিংহ শাক্ত মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে গৌহাটির নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্রের দ্বীপে উমানন্দ ভৈরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, বাঙ্গালাদেশ ও কোচবিহার হইতে বহু আমিন আনাইয়া তিনি রাজ্যের জরিপ কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

গদাধর সিংহ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। সব কাজই বেশ সাহসের সহিত সম্পন্ন করিতেন। তিনি ধোদার আইল এবং আকা আইল এবং আরও অনেক রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বহু জলাশয় ও প্রস্তর সেতু তাঁহার শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গদাধর সিংহের দুই পুত্রের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইলেন। রাজধানী গড়গাঁয়ে তিনি অভিষিক্ত হইলেন। ইনি রুদ্রসিংহ উপাধি লইলেন। ইঁহার আহোম নাম সুক্রাংফা।

রুদ্রসিংহ
১৬৯৬—১৭১৪

রুদ্রসিংহ রাজা হইয়াই পিতা কর্ত্তৃক নিগৃহীত বৈষ্ণবদিগকে রক্ষা করিলেন। রাজা নিজেও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। নিগৃহীত বৈষ্ণব গোঁসাইদিগকে আহ্বান করিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মালোচনার সুযোগ দিলেন। তাঁহাদিগের মাজুলি নামক স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন, তদবধি মাজুলিই বৈষ্ণব গোঁসাইদের পীঠস্থানরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিদের রক্ষা

রুদ্রসিংহের ইষ্টক দ্বারা প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী গড়গাঁও সুশোভিত করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোন রাজমিস্ত্রী ছিলনা, এজন্য তিনি কোচবিহার রাজ্য হইতে ঘনশ্যাম নামক একজন সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী আনয়ন করিয়া তাহার দ্বারা শিবসাগর, চরাইদিও এবং শিব সাগরের নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক ইষ্টক-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ঘনশ্যামকে রাজা বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ দেওয়ার যখন ব্যবস্থা করিতেছিলেন সে সময়ে প্রকাশ পাইল ঘনশ্যাম আসাম রাজ্যের অবস্থা, বাড়ীঘর এবং লোকজন, সৈন্য সামন্ত প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। তখন প্রকাশ পাইল যে মুসলমানদের নিকট আহোমদের আভ্যন্তরীন অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্যই সে এইরূপ করিয়াছে। ঘনশ্যামের এই অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল।

রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ

কাছাড়িগণ এ সময়ে তাঁহাদের রাজা তাম্রধ্বজের অধীনে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাম্রধ্বজ আহোমদের অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রুদ্রসিংহ কাছাড়িদের এইরূপ ধৃষ্টতায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং কাছাড়িদিগকে দমন করিবার জন্য অগোণে বড় বড়ুয়ার অধীনে ৩৭,০০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অপর দিকে পানি ফুকন্ ও ৩৪,০০০ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাছাড়িরা পরাজিত হইল। আহোমগণ কাছাড়িদের রাজধানী মাইবং নগরে প্রবেশ করিলেন এবং একটী কামান ও ৭০০ বন্দুক হস্তগত করিলেন। তাম্রধ্বজ পলায়ন করিয়া জয়ন্তিয়ায় গমন করেন

কাছাড়িদের সহিত যুদ্ধ

এবং সেখানকার রাজা রামসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওদিকে আহোম সৈন্যেরা খাসপুর আক্রমণ করিতে আসিয়া পরাজিত হইলেন। জয়ন্তিয়া রাজ যখন জানিতে পারিলেন যে আহোমেরা পরাজিত হইয়াছে, তখন সুযোগ বুঝিয়া আশ্রিত তাম্রধ্বজকে বন্দী করিয়া বান্দাশীল ও ইচ্ছামতীর কাছাড়ী দুর্গ অধিকার করিলেন। তাম্রধ্বজ এই ভাবে বিপন্ন হইয়া আহোম রাজের নিকট এক গুপ্তচর পাঠাইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। আহোমসৈন্যেরা জয়ন্তিয়া রাজা রামসিংহকে বন্দী করিলেন এবং তাম্রধ্বজকে মুক্ত করিলেন। রুদ্রসিংহ তাম্রধ্বজকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং বহুমূল্য উপহার দিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। এ সময় মধ্যে রামসিংহের মৃত্যু হইল।

বঙ্গ জয়ের উদ্যোগ

কয়েক বৎসর পরে রুদ্রসিংহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণযাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গদেশ আক্রমণের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তাহা ভাল করিয়া বোঝা যায় না; কেহ কেহ, বলেন যে কীর্ত্তি ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, আবার কেহ কেহ এইরূপ মতাবলম্বী যে পুণ্যতোয়া গঙ্গানদী পর্য্যন্ত রাজ্য সীমান্তঃভুক্ত করিবার বাসনাই একমাত্র কারণ। বঙ্গদেশে রণ-অভিযান লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য তিনি বিশেষভাবে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কামান, বন্দুক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। কাছাড়ি এবং জয়ন্তিয়ার রাজা ও তাঁহাদের সৈন্য সামন্ত সহ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কাছাড়ি রাজা ১৪,০০০ এবং জয়ন্তিয়ার রাজা ১০,০০০ সৈন্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে ৬০০ শত

দাফ্লা সৈন্য আসিয়াছিল। রুদ্রসিংহের এ সমুদয় উদ্যোগ আয়োজন বৃথা হইল, হঠাৎ গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রুদ্রসিংহ পরলোক গমন করিলেন।

আহোম রাজাদের মধ্যে রুদ্রসিংহ একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তাঁহার শাসনাধীনে ছিল।

রুদ্রসিংহের চরিত্র ও কীর্ত্তি-কথা

রুদ্রসিংহ যদিও লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, তথাপি অসাধারণ ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। ইষ্টক-নির্ম্মিত রাজ-প্রাসাদাদি তিনিই সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মাণ করেন। নামডাং ও দিসৌ নদীর উপরকার প্রস্তর সেতুও তাঁহার নির্ম্মিত। জয়সাগরের বৃহৎ সরোবর ও মন্দির তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। জয়সাগর নামক সরোবর আজও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সমুদয় পার্ব্বত্য জাতি তাঁহার অধীন ছিল। তিনি তিব্বতের সহিত বাণিজ্যের প্রচলন করেন। রুদ্রসিংহ বিভিন্ন দেশের রীতি নীতি শিক্ষা পদ্ধতি ও শিল্প ইত্যাদি আলোচনা করিয়া নিজ রাজ্য মধ্যে তাহা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। ব্রাহ্মণদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন ও বঙ্গদেশে হইতে অধ্যাপক আনয়ন করিয়া শিক্ষা দানের বিধান তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। তিনি হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইয়া বঙ্গদেশের গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবসাগর ও নওগাঁয়ের জরিপের কার্য্য তাঁহার সময় শেষ হয়।

শিবসিংহ ১৭১৪—১৭৪৪

রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবসিংহ রাজা হইলেন। পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে তিনিই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার আহোম নাম ছিল সুতাংফা। বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ ও আয়োজন তিনি পরিত্যাগ করিলেন এবং পিতার জীবিত কালের আদেশ

অনুযায়ী কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের মন্ত্র-শিষ্য হইলেন। এই কৃষ্ণরামের উপরই কামাখ্যাদেবীর পূজার ভারও অর্পিত হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে দাফ্‌লারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তিনি তাহাদিগকে বিশেষ দক্ষতার সহিত দমন করেন। দাফ্‌লাদের রাজ্যের সীমায় এক সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মিত হইল। শিবসিংহ ব্রাহ্মণদের কথাও দৈবজ্ঞদের গণনা খুব বিশ্বাস করিতেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে এক দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলেন যে শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইবে। শিবসিংহ ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার বড় রাণী ফুলেশ্বরীর হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করেন। রাণী, প্রমত্তেশ্বরী নাম ধারণ করিয়া রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। রাণীর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচারিত হইল। রাণী প্রমত্তেশ্বরী শাক্তমতাবলম্বিনী ছিলেন। এক শূদ্র বৈষ্ণব প্রজা দুর্গা পূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তিনি তাঁহাকে এক দেব-মন্দিরে বলি প্রদান করেন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফুলেশ্বরীর মৃত্যু হইল। ফুলেশ্বরীর মৃত্যুর পর রাজা তাঁহার ভগ্নী অম্বিকাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে বড় রাজা (রাণী) করিয়া দিলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অম্বিকার মৃত্যু হইল। ইঁহার পর সর্ব্বেশ্বরী রাণী হইলেন। সর্ব্বেশ্বরীর শাসনকালে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবসিংহের মৃত্যু হয়। শিবসিংহ বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন। তিনি বহু দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তাঁহার শাসনকালে ধাইআইল নামক রাজপথ, গৌরী সাগর, শিব সাগর ও কালুগ্রামের দীঘী খনিত হইয়াছিল। শিবসিংহ কামরূপ, বাকৃতা প্রভৃতির জরিপ কার্য্য সমাপন করেন।

তাঁহার রাজত্বকালে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিল (Bill) গড্উইন্ (Godwen) লিষ্টার (Lister) এবং মিল (Mill) রঙ্গপুরে যাইয়া শিবসিংহের সহিত দেখা করেন। রাজা, নগরের সম্মুখস্থ তোরণ-দ্বারে তাঁহাদিগের সহিত দেখা করেন। ইউরোপীয়েরা মাটিতে পড়িয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

প্রমত্ত সিংহ
১৭৪৪—১৭৫১

রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর প্রজাগণ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রমত্তসিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন করিয়া আদমসুমারী করেন। গড়গাঁও, রঙ্গপুর, প্রভৃতি স্থানে নূতন তোরণ ও অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মিত হইল। তিনি গৌহাটিতে রুদ্রেশ্বর এবং শুক্রেশ্বর নামক দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রমত্তসিংহ দয়ালু এবং প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করিয়া ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রমত্তসিংহের মৃত্যু হইল।

রাজেশ্বর সিংহ
১৭৫১—১৭২৯

প্রমত্তসিংহের মৃত্যুর পর—রুদ্রসিংহের চতুর্থ পুত্র রাজেশ্বর সিংহ রাজা হইলেন। রাজেশ্বর সিংহ বেশ যোগ্য নৃপতি হইলেও বিলাসপ্রিয় ছিলেন বলিয়া রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ ব্যাপারে বড় একটা মন দিতেন না। বড় বড়ুয়ার উপরই সব ভার দিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দাফ্লাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। রাজেশ্বর সিংহ তাহাদিগকে দমন করেন এবং তাহাদের সীমান্ত প্রদেশে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন যেন ভবিষ্যতে আর তাহারা সমতল ভূমিতে আসিতে না পারে। এ সময়ে মিকিরেরাও বিবিধ অত্যাচার করিতে থাকে। রাজেশ্বর সিংহ তাহাদিগকেও দমন করেন। ইহার অল্প দিন পর মানেরা মণিপুর আক্রমণ করে। মণিপুরের রাজা জয়সিংহ তরুণ আহোম রাজের

সাহায্য প্রার্থনা করিলেন—রাজেশ্বর সিংহ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বহু সৈন্য লইয়া মণিপুর গমন করিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ পীড়িত হইয়া পড়ায় এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আহোম রাজ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানদিগকে মণিপুর হইতে তাড়াইয়া দেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজেশ্বর সিংহ গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং কুড়ি দিন রোগ ভোগ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজেশ্বর সিংহ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বহু দেব মন্দির নির্ম্মাণ করেন। একবার গৌহাটি যাইয়া সমুদয় দেব মন্দিরে পূজা ইত্যাদি করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীসিংহ ১৭৬৯—১৭৮০

রাজেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর রুদ্রসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মী-সিংহ রাজা হইলেন। রাজেশ্বর সিংহের পুত্রদ্বয় কামরূপে নির্ব্বাসিত হইলেন। লক্ষ্মী সিংহ ৫৩ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী সিংহ রাজ্য শাসন-সংরক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে বড় বড়ুয়ার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বড় বড়ুয়া এজন্য অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠেন এবং নানাভাবে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। অত্যাচারী মোয়ামারিয়া জাতিকে দমন করিবার একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া সকল প্রজা এক মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। লক্ষ্মী সিংহ যুদ্ধের সময় জয়সাগরের তীরবর্ত্তী মন্দির মধ্যে বন্দী হইলেন। পরে তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে মুক্ত করে। এই অপমান তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছিল—১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি বহু দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে "রুদ্রসাগর" নামক সুবৃহৎ সরোবর খনিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীসিংহ পরলোক গমন করেন।

আহোম রাজাদের অবনতি ও পতন

গৌরীনাথ সিংহ ১৭৮০-১৭৯৫

লক্ষ্মীসিংহের পর তাঁহার পুত্র যুবরাজ গৌরীনাথসিংহ রাজা হইলেন। গৌরীনাথের আহোম নাম ছিল—সুহিতপাংফা। রাজা হইয়াই তিনি নিজবংশীয় রাজকুমারগণকে বিকলাঙ্গ করিলেন। বড় বড়ুয়াকে গৌরীনাথ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিলেন। কিন্তু বড় বড়ুয়ার প্রাধান্য বেশি দিন ছিলনা—কেননা তিনি রাজার সহিত পরামর্শ না করিয়াই অনেক গুরুতর রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন, ইহাতে গৌরীনাথ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। মোয়ামারিয়ারা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না কেননা তিনি তাহাদিগকে বিশেষ রূপে নির্য্যাতিত করেন। তাহারা একবার সুযোগ পাইয়া গৌরীনাথকে বধ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফলকাম হয় নাই, গৌরীনাথ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন।

এই ঘটনার পর গৌরীনাথ মোয়ামারীদিগকে শাসন করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিলেন। নব নিযুক্ত বড় বড়ুয়া এবং বড় গোহেইন্ তাহাদের বিরুদ্ধে রণাভিযান করিয়া তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিলেন। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইল। বন্দীকৃত মোয়ামারি স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদিগকে পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইল।

এই অত্যাচার ও অমানুষিক নির্য্যাতন মোয়ামারিরা নীরবে সহ্য করিলনা। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী

হইল। গৌরীনাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। মোয়ারিয়ারা আহোমদিগকে পরাজিত করিয়া রঙ্গপুর অধিকার করিল। গৌরীনাথ রাজধানী রঙ্গপুর হইতে গৌহাটিতে সরাইয়া আনিলেন। বড়ফুকান্ও সুযোগ পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল।

এই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির দরুণ দেশে ভয়ানক বিপ্লব দেখা দিল। দেশের সর্ব্বত্র অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। প্রজাগণ নানা ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িল, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি ও ধনরত্ন লইয়া বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। মোয়ামারিরা গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া, মড়াই লুটিয়া ক্ষেতের ফসল পয়মাল করিয়া দেশে ধ্বংসের আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দেশের অবস্থা এমন ভীষণতর হইয়া পড়িয়াছিল যে অন্নাভাবে পীড়িত নর-নারী নিজ নিজ সন্তান-বিক্রয় করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। উচ্চবংশীয় ব্যক্তিরা পেটের দায়ে কুকুর, শৃগাল, মহিষ ও গোমাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিপন্ন গৌরীনাথ কাছাড়, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট রাজার সাহায্য চাহিয়াও সাহায্য পাইলেন না। কেবল মণিপুরের রাজা পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারি হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। মোয়ামারিরা মণিপুরী সৈন্য ও আহোম সৈন্যদের মিলিত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা

নিরুপায় গৌরীনাথ ইংরাজরাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এ সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারেল ছিলেন। তাঁহার আদেশে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কাপ্তান ওয়েলস্, লেফটেনাণ্ট ম্যাক্গ্রেগারকে এবং উড্ সাহেব নামক একজন

সার্ভেয়ার বা আমীন কে সঙ্গে লইয়া কামরূপের দিকে চলিলেন। তাঁহারা প্রথমে গোয়ালপাড়ার দিকে আসিলেন। গোয়ালপাড়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজাধিকৃত হয়। সে সময়ে গোয়ালপাড়ার সহরের অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে যোগী-গোফা নামক স্থানে একটী সৈন্যাবাস ছিল। যোগীগোফা রঙ্গপুরের অধীনে ছিল, কখনও কোন রাজকর্ম্মচারী এ অঞ্চলে পরিদর্শন উপলক্ষে আসেন নাই। মিঃ রৌশ্ নামক একজন ইংরাজ গোয়ালপাড়াতে বাস করিতেন। কাপ্তান ওয়েলস্ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালপাড়া পৌঁছিলেন। রৌশ সাহেবের নিকট তিনি গৌরীনাথের বিপদ-কাহিনী বিস্তারিতভাবে শুনিতে পারিলেন। দারঙ্গের রাজা বিষ্ণুনারায়ণের নিকট হইতে মিঃ রৌশ এসমুময় কাহিনী বিস্তারিতভাবে শুনিয়াছিলেন। কাপ্তান ওয়েলস্ লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে গৌরীনাথের রাজ্যসম্পর্কিত সমুদয় অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিলেন এবং নিজে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখে গৌহাটির দিকে রওনা হইলেন। গৌহাটির পথেই রাজা গৌরীনাথের সহিত কাপ্তেন ওয়েল্‌সের দেখা হইয়াছিল। সহজেই গৌহাটি অধিকারে আসিল। আক্রমণকারী রাজা কৃষ্ণনারায়ণ ও তাঁহার সৈন্যদল ভয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। সেই সকল অস্ত্রাদি ইংরাজসৈন্যদের হস্তগত হইল। অবশেষে কাপ্তান ওয়েলস্ কৃষ্ণনারায়ণকে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মাত্র দুইশতআশীজন সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। এইবার রাজ্যের বিশৃঙ্খলাভাব এবং দুরবস্থা দেখিয়া ওয়েলস্ শাসনের সুব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলেন। তিনি বড় ফুকনের হাতে

ওয়েলসের রাজ্য-শাসন ব্যবস্থা

নিম্ন আসামের শাসনভার দিলেন। কৃষ্ণনারায়ণ রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সামান্য ভূম্যধিকারীর ন্যায় বাস করিতে বাধ্য হইলেন। বিদ্রোহীগণের দলপতিরা রঙ্গপুরে বন্দী হইলেন। বিদ্রোহী মোয়ামারীরা অনেকেই নিহত হইল এবং অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা বন্দী হইল। গৌরীনাথ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজ সৈন্যেরা বঙ্গদেশে ফিরিয়া গেল। গৌরীনাথ রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া জোরহাটে, স্থানান্তরিত করিলেন। খাম্‌তি নামক এক জাতীয় লোক এ সময়ে সদিয়ায় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। এ সময়ে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীনাথের মৃত্যু হয়।

গৌরীনাথের চরিত্র

গৌরীনাথ—অযোগ্য নৃপতি ছিলেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর, অবিবেকী, রক্তপিপাসু, ভীরু এবং কাপুরুষ ছিলেন। কাপ্তান ওয়েলস্ গৌরীনাথের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—"লোকটা কাজ করিবার অযোগ্য, কেবল স্নান ও পূজা এ দুইটির একটা লইয়াই দিনের অনেকটা সময় কাটান। আফিমের নেশায় প্রায় সময় বিভোর হইয়া থাকিতেন।" সামান্য অপরাধেই ভৃত্যগণের চক্ষু উৎপাটন করিতেন কিংবা নাক ও কাণ কাটিয়া দিতেন। রাজার কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার একেবারেই কোন আগ্রহ বা যত্ন ছিল না। পারিষদদলেরা যাহা বলিতেন তাহাই পালন করিতেন। এই প্রিয় পারিষদেরা নানা ভাবে রাজধন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছিল। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস বলিয়া কিছু ছিল না। তাঁহার রাজত্ব-কালে প্রজাসাধারণ দারুণ ক্লেশভোগ করিয়াছিল। মোয়ামারিয়া-গণ বর্গীদের মত গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া প্রজাদের দুরবস্থার একশেষ করিয়াছিল। এই অত্যাচার

ও নির্য্যাতনের ফলে বহু সমৃদ্ধ-পল্লী একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ওয়েলস্ সাহেবের লিখিত বিবরণ

সে সময়ে আসাম রাজ্য সম্বন্ধে ওয়েলস্ সাহেব যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। সে সময়ে গৌহাটি সহর ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরেই বিস্তৃত ছিল। গৌহাটি বেশ বড় এবং জনাকীর্ণ নগর ছিল। গৌহাটি সহরের একদিকে একটী দুর্গ ছিল, সেই দুর্গ মধ্যে সৈন্য থাকিত। সেখানে একশত ত্রিশটি কামান ছিল। তাহার মধ্যে কয়েকটি ইউরোপের আমদানি। আহোমের রাজধানী রঙ্গপুর ও বেশ জনাকীর্ণ বড় সহর ছিল। পরিধি ছিল প্রায় কুড়ি মাইল। নগরের মধ্যেও একটী প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ছিল। সহরের চারিদিকের ভূমি শস্যশ্যামল সুন্দর কৃষি-ক্ষেত্রে পরিশোভিত ছিল। সে সময়ে এক টাকায় সাতমণ আটমণ ধান বিক্রয় হইত। পাঁচ টাকায় একটা মহিষ এবং দুই টাকায় একটা গরু পাওয়া যাইত। বাঙ্গালাদেশের সহিত আসামের ব্যবসায়টা তখন বেশ ভাল ভাবে চলিতেছিল। লবণের আমদানিটাই ছিল খুব বেশি। লবণ ও আফিম এ দুইটা জিনিষই আসামে দুর্মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রতি বৎসর ১২০,০০০ মণ লবণ রপ্তানি হইত।

কমলেশ্বর সিংহ ১৭৯৫—১৮১০

কিনারাম রাজা হইয়া হিন্দু নাম কমলেশ্বর সিংহ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আহোম নাম ছিল সুক্লিংফা। কমলেশ্বর সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া বড় গোহেইনের হস্তে শাসনের ভার অর্পণ করেন। বড় গোহেইন্ বেশ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। বড় গোহেইন্ বিশৃঙ্খল রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানের জন্যই সর্ব্ব প্রথম মনোযোগী

হইলেন। সৈন্যদল বৃদ্ধি করা হইল এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাজকোষ অর্থ শূন্য হওয়ায় প্রত্যেক **সত্রের** অধিকারীদের নিকট হইতে অবস্থা অনুযায়ী চার হাজার টাকা হইতে যাহার যেরূপ শক্তি ও সামর্থ তদনুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইল।

হরদত্ত ও বীরদত্তের কামরূপ আক্রমণ

কমলেশ্বরের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরে কামরূপে এক বিদ্রোহের উদ্ভব হয়। তখন **হরদত্ত** ও **বীরদত্ত** নামক দুই ভাই কোচবিহারের রাজা ও বিজনীর রাজার গোপন সাহায্য পাইয়া কাছাড়ি, পাঞ্জাবি ও হিন্দুস্থানী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কামরূপ আক্রমণ করেন। বহু লোক তাঁহাদের সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ সহকারে—উত্তর কামরূপ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। এই দল চলিত কথায় দুম্‌দুমিয়া নামে পরিচিত হইয়াছিল। গোয়ালপাড়ার মি রাউস্ (Mr. Raush) ইহাদের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

বড় ফুকন্ বেলতলা ও দিমারুয়ার ছোট ছোট রাজাদের সাহায্যে এবং একদল হিন্দুস্থানী সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া হরদত্ত বীরদত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—যাত্রা করিলেন। অতি সহজেই এই বিদ্রোহী দল পরাজিত হইল। বন্দী হরদত্ত ও বীর দত্তকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। বড় ফুকনের এই অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাঁহাকে রাজা প্রচুর পুরস্কার দিলেন এবং প্রতাপবল্লভ এই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিলেন। দাফ্‌লা, মোয়ামারিয়া, খাম্‌তি ও সিংফো জাতিগণ তাঁহার কঠোর শাসনে শান্ত হয়। তিনি তাহাদের অনেককে খাসপুর ও জয়ন্তিয়ার দিকে তাড়াইয়া দেন।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য মধ্যে ভয়ানক বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছিল। কমলেশ্বরও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। কমলেশ্বর পনের বৎসর ছয়মাস কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোয়ামারিরা আর মাথা তুলিতে পারে নাই। রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। জনসাধারণের অবস্থা ও বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। রাজ্যের এই উন্নতির জন্য বড় গোহেইনই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বড় গোহেইন্ যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তেমনি রাজ্য শাসন-সংরক্ষণেও যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। কমলেশ্বর সিংহ বড় গোহেইনের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া রাজ্য-সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর রাজধানীর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জোরহাটকে তিনি নানারূপে সমৃদ্ধ করেন। ভোগদাই নামক বিরাট জলাশয় খনন করিয়া জোরহাটে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন।

চন্দ্রকান্ত
১৮১০—১৮১৮

বুড়া গোহেইন্ কমলেশ্বর সিংহের ভ্রাতা চন্দ্রকান্তকে সিংহাসন প্রদান করেন। চন্দ্রকান্তের আহম নাম ছিল সুদিংফা। চন্দ্রকান্ত বালক বলিয়া বুড়া গোহেইনই সমুদয় রাজ কার্য্য—পরিচালন করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে এই বুড়া গোহেইনের মৃত্যু হয়। তৎপরবর্ত্তী বুড়া গোহেইন্ অত্যন্ত দুর্বিনীত ও অহঙ্কারী ছিলেন; বালক চন্দ্রকান্তের উপর অন্যায় ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বড় ফুকন্ বুড়া গোহেইনের প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য কলিকাতা যাইয়া তদনীন্তন গভর্ণার জেনারেলকে আহোমরাজার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে অনু-

রোধ করিলেন—গভর্ণার জেনারেল তাহাতে রাজি হইলেন না। এই দিকে ব্যর্থ হইয়া ব্রহ্ম-নৃপতিকে আসাম আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বড় ফুকন্ বদনচন্দ্র ব্রহ্মদেশের রাজাকে বুঝাইয়াছিলেন যে—বুড়া গোহেইন আহোম রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। দেশের লোকের জীবন বিপন্ন, কখন কাহার উপর কিরূপ নির্য্যাতন চলে তাহার কোন ঠিকানা নাই। ব্রহ্মদেশের রাজা বড় ফুকনের বাক্যে সম্মত হইয়া কামরূপ আক্রমণ করিলেন। বহু গ্রাম ও পল্লীধ্বংস হইল। রাজধানী জোরহাট তাঁহাদের অধিকারে আসিল। এসময়ে বুড়াগোহেইনের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে আহোমদের বিশেষ ক্ষতি হইল। চন্দ্রকান্তের মন্ত্রীগণের মধ্যে বিবিধ অশান্তির সৃষ্টি হইল—চন্দ্রকান্ত ও আপনাকে বিপন্ন মনে করিয়া রঙ্গপুরে পলায়ন করিলেন।

ব্রহ্মদেশের রাজার আক্রমণ

ব্রহ্মদেশীয়দের প্রাধান্য প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কামরূপে বিরাজিত ছিল। চন্দ্রকান্তের সহিত বর্মনদের নানা কারণে মত-ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্মনরা আহোমদের রাজ্য শাসনের বিধি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দারঙ্গের রাজাকেও বর্মনরা আনুগত্য স্বীকার করাইয়াছিলেন। চন্দ্রকান্ত সিংহ বর্মন দিগকে তাড়াইবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার পলায়নের পর পুরন্দর সিংহ রাজা হন। পুরন্দর সিংহ রাজা হইয়া একটী অতি হীন নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন, তিনি চন্দ্রকান্তের দক্ষিণ কাণ কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যতে রাজা হইবার অযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এ সময়ে পাঁচ বৎসর কাল মানেরাও কামরূপে রাজত্ব করেন। কিছু দিন পরে বর্মনদের সঙ্গে ইংরাজের বিবাদ উপস্থিত হইল। চন্দ্রকান্ত সুযোগ পাইয়া

ব্রহ্মদেশীয়দের শাসন ১৮১৯—১৮২৪

পুরন্দরসিংহ

সংগোপনে রঙ্গপুরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে ব্রতী হইলেন। মানেরা নানা ভাবে প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। অনেক পাহাড়িয়া জাতি বর্মনদের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। খাদ্যাভাবে প্রজাদের নানাদিক্ দিয়া ভীষণ অসুবিধা হইতে লাগিল।

বর্মনরা কামরূপের নানা স্থানে যে কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহারা বহু লোককে একত্রিত করিয়া জীবন্ত অবস্থায় আগুণে পোড়াইয়া মারিয়াছে। শিশু, বালক, যুবক ও বৃদ্ধ বলিয়া কাহাকেও রেহাই দেয় নাই।

বর্মনদের এই অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা মিঙ্গিমহাবান্দুলা ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া গেলে তাঁহার স্থানে যে শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন তিনি কামরূপ রাজ্যে শান্তি বিধানের চেষ্টা করিলেন। নির্য্যাতন, নরহত্যা ও লুণ্ঠন বন্ধ হইল। যোগ্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। শাসন—সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হইল। বর্মনদের বেশি দিন কামরূপে প্রভুত্ব করিতে হইল না। ইংরাজ রাজ অল্পকাল মধ্যেই কামরূপে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

আহোমদের শাসন-প্রণালী

আহোমদের রাজ্যশাসন বিধি-ব্যবস্থা

আহোমদের শাসন-প্রণালীতে বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। রাজা, শাসন-সংরক্ষণের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও তাঁহার তিনজন বিচক্ষণ মন্ত্রণাদাতা থাকিতেন। তাঁহারা **গোহেইন্** নামে অভিহিত হইতেন। গোহেইন্‌রা রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে কাজ করিতেন। ঐ সকল প্রদেশে তাঁহারা একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন কিন্তু রাজ্যের সাধারণ ব্যাপারে ভিন্ন দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি স্থাপন কিংবা অন্য কোনরূপ গুরুতর রাজকার্য্যে তাঁহাদেরও যেমন রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হইত, রাজারও আবার এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির না করিয়া কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না।

রাজার উত্তরাধিকার-সূত্র

আহোম রাজাদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পিতার পর পুত্রের রাজা হইবার প্রথা বিদ্যমান ছিল। পরবর্ত্তীকালে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। রাজার ভ্রাতারাও রাজা হইয়াছেন।

রাজ্যাভিষেক রীতি

রাজ্যের অভিষেক-ক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। দেব-বিগ্রহের সম্মুখে বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান যাগযজ্ঞ ও দান ধ্যান করিয়া রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। গোহেইনরাও উত্তরাধিকার ক্রমে পদলাভ করিতেন। গোহেইনদের নিযুক্তি সম্বন্ধে রাজার অনেকখানি হাত থাকিত, তিনি সময় সময় পিতার পরই পুত্রকে

নিযুক্ত না করিয়া অন্যতম যোগ্য ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করিতে পারিতেন। গোহেইনদের অধীনে ১০,০০০ পাইক থাকিত। ইহাদের ভরণ-পোষণের জন্য বাৎসরিক ব্যয় হইতে ৯০,০০০ হাজার টাকা।

বড় বড়ুয়া ও বড় ফুকন্

আহোমদের রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও বিবিধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বড়ুয়া ও বড় ফুকনের পদ দুইটী রাজা প্রতাপসিংহের সময় সৃষ্ট হয়। বড় বড়ুয়ার ও বড় ফুকনের কাজে কেহই উত্তরাধিকার-সূত্রে নিযুক্ত হইতেন না। বড় বড়ুয়ার কাজ ছিল—সদিয়া ও কলিয়াবর অঞ্চলের শাসন-সংরক্ষণ, বিচারকার্য্য সম্পাদন এবং রাজস্ব আদায় করা। তাঁহার অধীনে ১৪,০০০ পাইক থাকিত। এই পাইকেরা রাজার আদেশ অনুযায়ী রাজকার্য্যেও নিয়োজিত হইতে পারিত।

বড় ফুকন প্রথমটায় কালঙ্গ এবং নওগাঁও অঞ্চলের প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যখন কলিয়াবর হইতে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত আহোমরাজ্য বিস্তৃত হয়, তখন বড় ফুকন গৌহাটীতে তাঁহার শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বড় বড়ুয়ার পদ হইতে বড় ফুকনের পদের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল।

বিচার কার্য্য

বড় ফুকনের বিচারের উপর আর আপিল চলিত না। রাজার আদেশ ব্যতীত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার না থাকিলেও তিনি জলে ডুবাইয়া অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিধান করিতে পারিতেন। আরও অনেক ছোট ছোট শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, যেমন সদিয়া খোয়া গোহেইন্ (সদিয়ার শাসনকর্ত্তা) ইনি সদিয়া অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মোরাঙ্গি খোয়া গোহেইন্ ধনশ্রী নদীর উপত্যকা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইত্যাদি।

বিচারকার্য্য, হিন্দু আইন অনুযায়ী সম্পাদিত হইত। ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে সাহায্য করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিধান বড় একটা ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর সন্তানেরা তুল্যাংশে সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতেন। কন্যা সন্তানেরা পিতৃ-সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হইতেন। ফৌজদারী দণ্ডবিধান অতি কঠোর ছিল। অতি সামান্য অপরাধেও ভীষণ নৃশংসতার সহিত প্রাণদণ্ডের বিধান হইত। ফৌজদারী দণ্ডবিধানের বা বিচারের বিষয় কিছুই লিখিত হইত না কিন্তু আদালতের বিচার সম্পর্কে মোকদ্দমার একটা মোটামুটি বিবরণ সংরক্ষিত হইত।

বিচার বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন—তিনজন গোহেইন্, বড় বড়ুয়া এবং বড় ফুকন্। ইঁহারা নিজ নিজ প্রদেশে যথাযোগ্য ভাবে শাসন-সংরক্ষণ এবং বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

দাসত্ব-প্রথা

দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদের জমি জমার চাষবাস নিজ নিজ গোলাম বা নফরদের দ্বারা সম্পন্ন করিতেন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই এই সব গোলাম বা নফর রাখিতে পারিতেন। প্রায় প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহেই এ সকল গোলামেরা থাকিত।

সামাজিক বিধি ব্যবস্থা

উচ্চ জাতি ও নীচ জাতি এবং সাধারণের মধ্যে সামাজিক বিভিন্নতাটা বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশীয় লোক ছাড়া কেহ জুতা বা ছাতা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। সাধারণের পাল্কী চড়িবার অধিকারও ছিল না। তবে এক হাজার টাকা রাজ সরকারে দিলেই এই অধিকার মিলিত। এইরূপ আরও নানারূপ রীতিনীতি কঠোর ভাবে সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল।

আহোমদের প্রচলিত মুদ্রার আকৃতি ছিল অষ্টকোণ। ওজন

মুদ্রা-পরিচয়

থাকিত ৯৬ রতি। কোচ রাজাদের মুদ্রার সহিত আহোম রাজাদের মুদ্রার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আহোম রাজা সুক্লেংমাং তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে সর্ব্ব প্রথম মুদ্রায় প্রচলন করেন। সেই মুদ্রার তারিখ হইতেছে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। ক্রমশঃ সকল রাজারাই মুদ্রার প্রচলন করেন। সুক্লেংমাং রাজার মুদ্রার আহোম ভাষা ও আহোম অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। জয়ধ্বজ সিংহ, চক্রধ্বজ সিংহ ও পরবর্ত্তী রাজাদের মুদ্রার বাঙ্গলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় রাজার ও মুদ্রার পরিচয় মুদ্রিত হইত।

আহোম রাজাদের উপাধির অর্থ

আহোম রাজাদের নামের আদি অক্ষর **সু** দিয়া আরম্ভ। সু—অর্থে বাঘ। শেষ শব্দ ফা—অর্থ স্বর্গ। সুখাফা - স্বর্গ হইতে আগত ব্যাঘ্র। এইরূপ মেন্—অর্থ সুন্দর। সুনেন্‌ফা—স্বর্গের সুন্দর বাঘ ইত্যাদি।

আসাম শব্দের উৎপত্তি

আসাম শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আসাম লিখিতেন। কেহ কেহ বলেন—অসমতল প্রদেশ বলিয়া অসম শব্দ হইতে "আসাম" হইয়াছে। আহোমদের কামরূপ আগমনের আগে কোথাও আসাম শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। আহম শব্দ হইতেই আসাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সে যুগে পূর্ব্ববঙ্গকে "সমতট" বলিত। আহোমেরা আসাম রাজ্যকে অতি সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্মণেরা এই দেশকে **অটন** বা **বৈটালী** এবং চীনদেশের লোকেরা বৈশালী এবং মণিপুরীরা 'টেউক' নামে অভিহিত করিতেন। সকল ঐতিহাসিক গণেরই এই মত যে আহোমেরা দীর্ঘ ৭০০ বৎসর কাল কামরূপ শাসন করেন বলিয়া কালক্রমে আহম রাজ্য—**আসাম** নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

কাছাড় ও কাছাড়ি রাজ্য

কাছাড়িদের পূর্ব্বকথা

কাছাড়িদের প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কাছাড়িরাই সকলের চেয়ে প্রাচীন। উত্তরবঙ্গের এবং গোয়ালপাড়া জেলার মেচ্‌দের সঙ্গে ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এক সময়ে কাছাড়িদের রাজ্য রঙ্গপুর হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী কাছাড়িরা **"বোদো"** বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। উত্তর কাছাড়িরা আপনাদিগকে **"দিমিসা"** বলে। **"দিমিসা"** শব্দ সম্ভবতঃ দিমিফিসা নামেরই রূপান্তর। **"দিমিফিসা"** শব্দের অর্থ, মহানদ ব্রহ্মপুত্রের সন্তান।

কোচদের সহিত ও কাছাড়িদের বেশ নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চুটিয়া, লালুঙ্গ মোরান্ এবং দক্ষিণ পাহাড়ের গারো ও টিপ্‌রাদের সহিতও ইহাদের নৈকট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, এক সময়ে আসামের অধিকাংশ এবং উত্তরবঙ্গ লইয়া একটা বৃহৎ "বোদো" রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

কাছাড়িদের রাজত্ব সম্পর্কে কোনও লিখিত বিবরণী নাই। আহোমদের ইতিহাসের সহিত যে অংশটুকু জড়িত আছে তাহারই খানিকটা যথার্থ ইতিহাস বলিয়া মনে হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কাছাড়িদের ইতিহাস

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তট দিয়া একটা কাছাড়ি রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ধনশ্রী নদীর উপত্যকাটিও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই শাখার পূর্ব্বদিকে **আহম্** এবং পশ্চিমদিকে **"কামৃতা"** নামক হিন্দু রাজ্য ছিল। আহম ও কাছাড়ি রাজ্যের সীমা স্থানে দীক্ষু নদী প্রবাহিত ছিল। প্রায় শতাধিক বর্ষ যাবত এই দীক্ষুনদী উভয় রাজ্যের সীমারূপে বর্ত্তমান ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর যুদ্ধ-বিগ্রহ

আহোমদের সহিত কাছাড়িদের বরাবরই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে-ছিল। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আহোমেরা কাছাড়িদের কাছে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নদীর উপত্যকা প্রদেশেই কাছাড়ি ও আহোমে যুদ্ধ হয়। প্রথমে কাছাড়িরা জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু পরে ভীষণ ভাবে পরাজিত হন। আহোমেরা এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া কাছাড়িদের রাজধানী দিমাপুর পর্য্যন্ত যাইয়া পৌছিয়াছিলেন। ক্ষুণখারা নামক কাছাড়ি রাজাকে পদচ্যুত করিয়া দিৎসাংকে তাঁহারা রাজা করিয়া আসিয়াছিলেন।

দিৎসাং ও আহোমদেরকলহ

১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দিৎসাংয়ের সহিত আহোমদের পুনরায় যুদ্ধ হয়। এই বারও আহোমেরা জয়ী হইয়া দিমাপুরে যাইয়া উপস্থিত হন। দিৎসাং ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই পরাজয়ের পর কাছাড়িরা দিমাপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং **মাইবং** নামক স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

দিমাপুরের ধ্বংসাবশেষ

দিমাপুর নামক যে বৃহৎ নগরে কাছাড়িদের রাজধানী ছিল, সেই নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও নিবিড় বনমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দিমাপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বুঝা যায় কাছাড়িরা অট্টালিকা ইত্যাদির নির্ম্মাণ ব্যাপারে আহোমদের অপেক্ষা বেশি

দিমাপুরের খোদিত প্রস্তর-স্তম্ভ

অভিজ্ঞ ছিলেন। দিমাপুর নগরের তিনিদিকে দুই মাইল দীর্ঘ ইষ্টক নির্ম্মিত প্রশস্ত প্রাচীর ও চতুর্থদিকে ধনশ্রী নদী। সম্মুখে একটী সুন্দর দরোজা। ১২ ফুট উচ্চ ও ৫ ফুট বেড় কয়েকটি সুন্দর স্তম্ভ বিরাজিত ছিল। সেই সুন্দর তোরণটি এখনও বিদ্যমান আছে। আহোমেরা কিন্তু এসময়ে বাঁশের তৈরী ও কাদার প্রাচীরে গঠিত গৃহে বাস করিত। কাছাড়িরা বলেন যে রাজা চক্রধ্বজ দিমাপুর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চক্রধ্বজ কাছাড়িদের চতুর্থ রাজা ছিলেন ।

কাছাড়িও আহোমদের যুদ্ধ-বিগ্রহ

ধীরে ধীরে আহোমেরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে আহোম ও কাছাড়ীদের মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিতে থাকে। শেষটায় আহোমেরা জয়লাভ করে এবং কাছাড়িরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া রাজধানী দিমাপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী আহোমেরা ধনশ্রী নদী পর্য্যন্ত গমন করেন। কাছাড়িদের রাজধানী দিমাপুর লুণ্ঠিত হয় এবং রাজধানী অধিকৃত হয়। কাছাড়ি-রাজ দেৎসঙ্গের সহিত বহু কাছাড়িও অতি নির্দ্দয় ভাবে নিহত হইয়াছিল।

মাইবঙ্গের রাজধানী স্থাপন

কাছাড়িরা আহোমদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধনশ্রী নদীর উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইয়া উত্তর কাছাড়ের নিকটবর্ত্তী মাহু নদীর তীরে মেইবঙ্গ বা মাইবঙ্গ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে। কিছু দিন পূর্ব্বে মাইবঙ্গের নিকট একটী রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ হইতে মাইবংয়ের রাজধানী প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায়। মুদ্রাটি রাজা যশোনারায়ণদেবের রাজত্বকালে প্রচারিত হয়। হরগৌরী ও শিবদূর্গার উপাসক এই নৃপতি রাজা

হাশেংসার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইবঙ্গে কাছাড়ি-রাজারা অনেক সুন্দর সুন্দর পাথরের বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এখানেও তাঁহারা শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না, প্রসিদ্ধ কোচরাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা শীলরায় বা চিলারায় কোচসেনা লইয়া ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে কাছাড়িরাজ "হিড়িম্বেশ্বর" উপাধিধারণ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কাছাড়, ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিল। প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ি রাজা ত্রিপুরা রাজের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে সেই সময়ে এই রাজ্য কাছাড়ি রাজকে দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে কাছাড়িরাজ্য উত্তর কাছাড়ের পাহাড়গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাছাড়িদের ইতিবৃত্ত ইহার বেশি জানা যায় না।

শত্রু দমন কর্তৃক জয়ন্তিয়া রাজার পরাজয়

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাছাড়িরাজ শত্রুদমন জয়ন্তিয়ার রাজা ধনমাণিককে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই বিজয়ের পর শত্রুদমন "অসিমর্দ্দন" এই বীরত্বসূচক নামক ধারণ করিয়াছিলেন। ধনমাণিকের ভ্রাতুষ্পুত্র যশোমাণিককে শত্রু-দমন বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যশোমাণিক ব্রহ্মপুর নামক স্থানে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, পরে উহা খাসপুর নামে অভিহিত হয়।

আহোমদের সহিত যুদ্ধ

ধনমাণিকের মৃত্যুর পর শত্রুদমন যশোমাণিককে মুক্তি দিয়া জয়ন্তিয়ার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দেন। যশোমাণিক কিছু-দিন পরে আহোম রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তিনি আহোম রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার কন্যাকে কাছাড়ি রাজ্যের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। গর্ব্বিত কাছাড়ি

রাজ এইরূপ অন্যায় প্রস্তাবে রাজি হইলেননা। এই সূত্রে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। শত্রুদমন যুদ্ধে আহোমদিগকে পরাজিত করিয়া **'প্রতাপনারায়ণ'** এই উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং রাজধানী মাইবঙ্গের নাম 'কীর্ত্তিপুর' রাখিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কাছাড়ি রাজারা প্রায় একশত বৎসর কাল সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

নরনারায়ণ ভীমদর্প এবং ইন্দ্রবল্লভ

শত্রুদমনের পর তাঁহার ছেলে নরনারায়ণ রাজা হইলেন। নরনারায়ণ অতি অল্প সময় রাজত্ব করিবার পরই পরলোক গমন করেন। নরনারায়ণের পর ভীমদর্প রাজত্ব করেন। ভীমদর্পের ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা ইন্দ্রবল্লভ রাজা হইলেন। ইন্দ্রবল্লভ আহোমদের সহিত সৌহার্দ্দভাব বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই।

বীরদর্পনারায়ণ

১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরদর্পনারায়ণ রাজা হইলেন। এ সময়ে আহোমদের রাজা ছিলেন চক্রধ্বজ সিংহ। চক্রধ্বজ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া যশস্বী হন, তাঁহার এই বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বীরদর্পনারায়ণ সংবাদ প্রেরণ করিলে পুনরায় অনেক দিন পরে উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সংস্থাপিত হয়।

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে বীরদর্পের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গৌরীধ্বজ রাজা হইয়াছিলেন। গৌরীধ্বজের সহিত আহোম রাজাদের প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল না। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীধ্বজের মৃত্যু হইলে একে একে তাঁহার দুই পুত্র মকরধ্বজ ও উদয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাম্রধ্বজ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আহোমেরা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে এতদূর লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহারা কোনদিক

দিয়াই কাছাড়িদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে অবসর পান নাই। এই ব্যাপারে কাছাড়িরা ক্রমশঃই সাহসী হইয়া উঠে। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়িদের রাজা **তাম্রধ্বজ** প্রকাশ্য ভাবে আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এসময়ে রুদ্রসিংহ আহোমদের রাজা ছিলেন। রুদ্রসিংহ তাম্রধ্বজের এই গর্ব্বিত ঘোষণার কথা শুনিয়া ৭০,০০০ সৈন্য লইয়া কাছাড় রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাম্রধ্বজ কোনও বাধা দিলেন না। তিনি পলাইয়া জয়ন্তিয়ার রাজা রামসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। আহোম-সেনা সহজেই রাজধানী মাইবঙ্গ অধিকার করিল। সেখানকার ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। আহোমেরা কিন্তু দীর্ঘকাল সেখানে থাকিতে পারিলেন না, তাহাদের বহুলোক জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি বিবিধ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এজন্য বাধ্য হইয়া তাহাদের কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল।

এদিকে সুযোগ বুঝিয়া জয়ন্তিয়ার রাজা রামসিংহ তাম্রধ্বজকে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং কাছাড় রাজ্যটিকে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে যত্নবান্ হইলেন। তাম্রধ্বজ কোনও কৌশলে আহোম রাজা রুদ্রসিংহের নিকট তাঁহার অবস্থা জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্র পাইয়া রুদ্রসিংহ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তিয়া আক্রমণ করিয়া রামসিংহকে পরাজিত করিয়া তাম্রধ্বজকে মুক্ত করিয়া আনেন। অতঃপর তাম্রধ্বজ একটী প্রকাশ্য দরবারে আহোমরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া করদানে এবং প্রতি বৎসর তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রুদ্রসিংহ দরবারের পর মাইবঙ্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার কিছুদিন পরেই ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাম্রধ্বজের মৃত্যু হইল। রাজা রুদ্রসিংহ তাঁহার চিকিৎসার্থ নিজের পারিবারিক চিকিৎসককেও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শূরদর্প ও অন্যান্য নৃপতিগণ

তাম্রধ্বজের পর রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র শূরদর্প। শূরদর্পের বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর ছিল। শূরদর্পের রাজত্বকালে ভুবনেশ্বর বাচস্পতি নামক একজন পণ্ডিত 'নারদিপুরাণ' নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'নারদিপুরাণ' চন্দ্রধ্বজের বিধবাপত্নী চন্দ্রপ্রভার আদেশে লিখিত হইয়াছিল।

শূরদর্পের পরবর্ত্তী প্রায় শতবৎসর কালের ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় নাই। আহোমদের লিখিত বিবরণীতেও নাই। এই সময়ে কাছাড়িরা আহোমদের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁহারা আহোমদের কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ের প্রধান প্রধান লোকেরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্ম উৎসব ব্যাপারে কাছাড়িদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র একটী প্রকাণ্ড তাম্রনির্ম্মিত গো-মূর্ত্তির ভিতরে প্রবেশ করেন। ইহার ভিতর হইতে বাহির হইবার পরেই তাঁহাদিগকে গো-গর্ভ সম্ভূত এবং যথার্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এবং এইরূপ প্রচার করা হয় যে কাছাড়িরাজগণ পাণ্ডুরাজার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের সন্তান। এবং ভীম হইতে বর্ত্তমান রাজাদের আমল পর্য্যন্ত একটা বংশাবলী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে ঐ সকল নামের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃত্রিম। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করিলেন যে ভীম যখন ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করেন, সে

সময়ে কাছাড় অঞ্চলে আসিয়া পড়েন। তখন হিড়িম্ব নামক এক রাক্ষস সেখানে রাজত্ব করিতেন। ভীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করিয়া তাঁহার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। ভীম ও হিড়িম্বার পুত্রের নাম ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ হইতেই কাছাড় রাজবংশের উৎপত্তি। হিড়িম্বাও ভীমের এই কাহিনী মহাভারতের অত্যন্ত প্রাচীন কথা। হিড়িম্ব রাক্ষস কাছাড়ে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণেরা কাছাড়রাজগণকে ক্ষত্রিয় করিবার জন্য এইরূপ আবিষ্কার করেন। তিন শত বৎসর অতীত হইয়াছে লিখিত পত্র বা খোদিত ফলকে হিড়িম্ব নামের ব্যবহার সর্ব্ব প্রথম পরিলক্ষিত হয়। এই সময় হইতেই কাছাড়ি রাজা আপনাকে "হিড়িম্ব" বা "হিড়িম্বরাজ" নামে অভিহিত করেন। ইহার পূর্ব্বে এইরূপ নামের ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

গোবিন্দচন্দ্র

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র রাজা হইলেন। তিনি রাজ্যের সুশাসনের জন্য আইনগুলির সংস্কার করেন। নিজ নামে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন। খাসপুরের স্নানমন্দির, বিষ্ণু-মন্দির ও দ্বাদশচক্রের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের শাসনকালে রাজ্যে নানারূপ বিদ্রোহের সূচনা হয়। কোহিদান নামক কৃষ্ণচন্দ্রের একজন কর্ম্মচারী গোবিন্দচন্দ্রের শাসনকালে উত্তর কাছাড়ে একদল রাজদ্রোহী গঠিত করে। গোবিন্দচন্দ্র কোহিদানকে নিহত করেন। কিন্তু কোহিদানের পুত্র তুলারাম আবার একদল বিদ্রোহী গঠন করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে উত্তর কাছাড়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা মার্জ্জিতসিংহ কাছাড় আক্রমণ

দিমাপুর কাছাড়ি রাজাদের প্রাসাদ-তোরণ

করেন। গোবিন্দচন্দ্র নির্ব্বাসিত মণিপুর-রাজের ভ্রাতা চৌরজিত-সিংহের সাহায্যে মার্জ্জিত সিংহকে পরাজিত করেন। চৌরজিত-সিংহ তখন কাছাড়ের এক অংশে নিজ অধিকার বিস্তার করেন। মার্জ্জিতসিংহ তাঁহার ভ্রাতা চৌরজিতসিংহের সহিত মিলিত হইয়া কাছাড় রাজ্য ভাগ করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে শ্রীহট্টে তাড়াইয়া দেন। গোবিন্দচন্দ্র ব্রহ্মদেশের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

ব্রহ্মদেশের রাজার সৈন্যদল আসিয়া কাছাড় আক্রমণ করে। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া কাছাড় হইতে ব্রহ্মবাসীদিগকে দূর করিয়া দিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে কাছাড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজদিগকে বাৎসরিক ১০০০০৲ টাকা কর স্বরূপ দিতে সম্মত হইলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু হয়। গোবিন্দচন্দ্রের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় কাছাড়ের লোকেরা ইংরাজ গভর্মেণ্টকে স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় রাজ্য ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভূত হইল। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের একটী মুদ্রা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গোবিন্দচন্দ্রকে ‘হিড়িম্বার রাজা’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মুদ্রায় কোন তারিখের উল্লেখ নাই।

নবম অধ্যায়

জয়ন্তিয়া রাজ্য

জয়ন্তিয়া রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসও কাছাড়ি রাজ্যের ও কাছাড়িদের ন্যায় ভাল করিয়া জানা যায় না। অনেক দিন পরে আহোমদের ইতিহাসের মধ্যে জয়ন্তিয়া রাজ্যের ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। খোদিতলিপিও তাম্রফলক হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি। পূর্ব্বে জয়ন্তিয়া রাজ্য জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং তাহার নিম্নস্থ বিস্তৃত সমতলভূমি জয়ন্তিয়া রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। পার্ব্বত্য-জয়ন্তিয়ায় শিনটেং নামক খাসি জাতি বাস করিত। বর্ত্তমান জয়ন্তিয়াপরগণায় বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানেরা বাস করিতেছে। জয়ন্তিয়ার অধিবাসীদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত নানারূপ কাহিনীতে পরিপূর্ণ সে সকল কথা আমরা আলোচনা করিলাম না। পূর্ব্বে এস্থানের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে নিজ দলপতির অধীনে বাস করিত। তাহারা কখন এক রাজ্যের অধীনে বাস করিতনা।

জয়ন্তিয়া রাজাদের কথা

জয়ন্তিয়া দেবীর পীঠস্থান জয়ন্তিয়া পুরী—জয়ন্তিয়া রাজধানী। কথিত আছে মহাভারতের যুগে প্রমীলা এদেশের রাণী ছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যের একটী মহাল ছিল। অর্জ্জুনের সহিত রাজস্থয়যজ্ঞের যজ্ঞাশ্ব লইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। জয়ন্তিয়ার অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও খাসিয়া বংশোদ্ভূত বলিয়া স্ত্রীলোকের গোত্রে রাজা হইবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

জয়ন্তিয়া রাজ্যের আদি যুগের ইতিহাস কিংবদন্তীমূলক। জয়ন্তিয়া পরগণার অধিবাসীরা তাঁহাদের দেশের রাজাদের একটা কিংবদন্তীমূলক নাম করিয়া থাকেন! তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধনমাণিক জয়ন্তিয়ার রাজা ছিলেন। ধনমাণিকের পূর্ব্বে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের রাজত্বের সময় এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পর্ব্বত রায়	...	...	১৫০০—১৫১৬
মাঝ গোসেইন্	...	...	১৫১৬—১৫৩২
বড় পর্ব্বত রায়	...	...	১৫৩২—১৫৪৮
বড় গোসেইন	...	...	১৫৪৮—১৫৬৪
বিজয়মাণিক	...	...	১৫৬৪—১৫৮০
প্রতাপ রায়	...	...	১৫৮০—১৫৯৬
ধন মাণিক	...	...	১৫৯৬—১৬০৫

পর্ব্বত রায় জয়ন্তিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও তিনি যে এই রাজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির মুলে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেই জয়ন্তিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ ও জয়ন্তিয়া পরগণা লইয়া একটী রাজ্য গঠিত হয়। জয়ন্তিয়ার রাজাদের নাম হইতে ইহা বোঝা যায় যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন আবার এইরূপও একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে জয়ন্তিয়া পরগণার শাসন-ভার কিছুদিন ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল—তাহাদের প্রথম চারিজন রাজার নাম যথাক্রমে কেদারেশ্বর রায়, ধনেশ্বর রায়, কন্দর্প রায় এবং জয়ন্ত রায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে জয়ন্তিয়ারাজ কোচগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। কোচবংশীয় নৃপতি নর-নারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি শিলারায় কোচরাজ্য বর্দ্ধিত করেন। সে সময়ে জয়ন্তিয়া রাজার নাম কি ছিল ভাল করিয়া জানা যায় না, তবে অনুমান হয় তাঁহার নাম ছিল বিজয়মাণিক। বিজয়মাণিক কোচদের বিরুদ্ধে খুব সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন—যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলে জয়ন্তিয়া, কোচরাজ্যের করদ রাজ্য হইল। নর-নারায়ণ তখন বিজয়ের পুত্র প্রতাপ রায়কে জয়ন্তিয়ার করদ রাজারূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস 'রাজমালায়' লিখিত আছে যে ত্রিপুরা নৃপতি ব্রজমাণিকও ঐ সময়ে জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ ১৫৮০ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কোচ নৃপতি কর্ত্তৃক জয়ন্তিয়া রাজের পরাজয়

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জয়ন্তিয়ার রাজা ধনমাণিক কাছাড়ের নৃপতির কাছে পরাজিত হন। কাছাড়ি নৃপতির করদ রাজ্য রূপে পরিগণিত হওয়ার পর সন্ধি হইয়াছিল। ধনমাণিকের মৃত্যুর পর কাছাড়ি রাজ যশমাণিক মুক্তিলাভ করিয়া জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এইরূপে জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে যশমাণিক কোচবিহারে গমন করিয়া সেখানকার এক রাজ-কন্যাকে বিবাহ করেন এবং জয়ন্তেশ্বরীর প্রতিমা নিজ রাজ্যে আনিয়াছিলেন।

কাছাড়ি রাজা কর্ত্তৃক জয়ন্তিয়া রাজের পরাজয়

যশমাণিকের পরে সুন্দররায় রাজা হইলেন। সুন্দররায়ের পর ছোট পর্ব্বতরায় রাজা হন। তাহাদের সময় দেওয়া হইল;—

যশোমাণিক	...	...	১৬০৫—১৬২৫

সুন্দর রায়	... ...	১৬২৫—১৬৩৬
ছোট পর্ব্বত রায়	... ...	১৬৩৬—১৬৪৭

যশোমাণিকের সময় আহোমদের সহিত জয়ন্তিয়ার রাজার বন্ধুভাব ছিল—কিন্তু পরবর্ত্তী রাজা যশমন্ত সিংহের সময় সে বন্ধুভাব হ্রাস পায়। সে সময়ে আহোমরাজ্যের কয়েকজন বণিক জয়ন্তিয়া রাজ্যে যাইয়া বাণিজ্য করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। তাহারা জয়ন্তিয়ার সীমান্ত প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে তাহারা জয়ন্তীয়ার রাজা কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। এই জন্য আহোমরাজের সহিত জয়ন্তিয়া রাজার কলহ উপস্থিত হয়। এই কলহ নয় বৎসর পরে দূর হইয়াছিল। যশোমন্ত ও তাহার পরবর্ত্তী রাজাগণের নাম দেওয়া গেল ;—

যশোমন্ত রায়	...	১৬৪৭—১৬৬০
বাণ সিংহ	...	১৬৬০—১৬৬৯
প্রতাপ সিংহ	...	১৬৬৯
লক্ষীনারায়ণ	...	১৬৬৯—১৬৯৭

রাজা লক্ষীনারায়ণ জয়ন্তিয়াপুরে একটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সেই রাজপ্রাসাদটি এখন ধ্বংস হইয়াছে। এই প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে লিখিত আছে যে ১৬৩২ শকে (১৭১০ খ্রীঃ অঃ) রাজা লক্ষীনারায়ণ ইহা নির্ম্মাণ করেন।

রাজা রামসিংহ

লক্ষীনারায়ণের পর রাজা রামসিংহ রাজা হইলেন। ইনি ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। রামসিংহ জয়ন্তিয়া রাজ্যের বিশেষ উন্নতি করেন। তিনি রাজ্যবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ ও আহোমরাজা রুদ্রসিংহের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে রামসিংহ কিরূপ ভাবে তাহাতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আহোমগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ প্রভুত্ব স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহ ইংরাজদের অধিকৃত সমতল ভূমিতে অত্যাচার করিতে থাকেন, তাঁহার এই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগভর্মেণ্ট মেজর হেনিকার সাহেবকে সৈন্য সহ জয়ন্তিয়ায় প্রেরণ করেন। জয়ন্তিয়ার রাজা জরিমানা দিয়া ক্ষতিপূরণ করেন। ছত্রসিংহের পর ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রানারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। তৎপর ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নারায়ণ রাজা হন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্মনরা জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা, ইংরাজরাজের সাহায্যপ্রার্থী হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ ইংরাজ রাজ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন—বর্মনরা—তখন জয়ন্তিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রসিংহ জয়ন্তিয়ার রাজা হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তিয়া রাজ্য শ্রীহট্টের সহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তঃর্ভুক্ত হয়। ইহার একটা কারণ এই যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তিয়ার রাজা ফালজুরের পীঠস্থানে চারিজন বালককে ধৃত করিয়া বলি প্রদান করেন। ইংরাজরাজ এই নৃশংস কার্য্য রহিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না তখন জয়ন্তিয়ায় রাজ্যের সমতলস্থিত ভূভাগ শ্রীহট্টের সহিত সম্মিলিত করেন।

জয়ন্তিয়ার রাজধর্ম্ম

জয়ন্তিয়ার রাজারা শাক্ত মতাবলম্বী। নরবলি দিয়া দেবতার তুষ্টি সাধন ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত ছিল।

দশম অধ্যায়

মণিপুর রাজ্যের কথা

মণিপুর রাজ্যের প্রচীন কথা

মণিপুর একটী প্রাচীন রাজ্য। বন-জঙ্গল ও দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত মণিপুর রাজ্য বহু দিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। এদেশের অধিবাসীরা দুর্দ্দম ও স্বাধীন। শানেরা মণিপুরের নাম দিয়াছিলেন কশি, মানেরা দিয়াছিলেন—'কঠি' শব্দেরই অপভ্রংশ। আহোমেরা বলিতেন মেখেলি এবং কাছাড়িরা বলিতেন মেঘিলি। মণিপুরের প্রাচীন আসামী নাম হইতেছে—মগলউ'। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে মণিপুরিরা মঙ্গোলিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। মণিপুরিদের ভাষার সহিত কুকিদের ভাষার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। মণিপুর সম্পর্কিত অনেকটা ইতিহাস খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বেশ জানিতে পারা যায়। এসময় মধ্যে সাতচল্লিশ জন রাজা রাজত্ব করেন। এই হিসাবে প্রত্যেক রাজা ছয়ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এইরূপ ধরিয়া লইতে হয়। এই দীর্ঘকাল রাজত্বের মধ্যে কেবল একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল—সে হইতেছে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে খুম্বাৎ রাজ্য জয়।

গরিবনওয়াজের রাজ্যকাল

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে মণিপুর রাজ্যের ইতিহাস অনেকটা প্রামাণিক। এ সময়ে পামহৈইবা বা পামহীব নামে একজন নাগা, হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাকে 'গরিবনওয়াজ' বা গরীব-নবাজ অর্থাৎ গরীবদের মুরুব্বি এই উপধি-ভূষণে ভূষিত করেন। তাঁহার অধীনের ব্রাহ্মণরা ইঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং

একটা গল্প রচনা করিয়ামহাভারতের উল্লিখিত মণিপুরের সহিত—এই মণিপুরের সামঞ্জস্য নির্ণয় করিলেন এবং ইঁহারা অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া—প্রচার করিলেন। আসামের মণিপুর যে—মহাভারতের মণিপুর নয় তাহা মহাভারত হইতেই বিশদভাবে জানিতে পারা যায়। মহাভারতের বভ্রুবাহন রাজার রাজ্য হইতেছে কলিঙ্গ দেশে, কাজেই সেই মণিপুর যে উড়িষ্যার কোথাও হইবে সে কথা না বলিলেও চলে।—গরিবনওয়াজ যে বংশেরই হউন না কেন তিনি একজন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ—হইতে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ এই কয়েক বৎসর কাল তিনি ক্রমাগত ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মদেশের বহু সমৃদ্ধিশালী নগর অধিকার করিয়াছিলেন। গরিবনওয়াজ পঁচিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। পরে তাঁহার পুত্র উগত শাহের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত এবং নিহত হইতে হইয়াছিল। গরিবনওয়াজ অল্প সময়ের মধ্যে মণিপুরের ইতিহাসে যে কীর্ত্তি ও গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহা লোপ পাইয়াছিল। দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। বর্ম্মনেরা ১৭৫৫—১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মণিপুর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল শেষটায় মণিপুর রাজ্যের কিয়দংশ ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সময়ে জয়সিংহ নামে এক ব্যক্তি মণিপুরে

প্রথম বর্মনদের আক্রমণ

* The Manipur mentioned in the **Mahabharat** was the capital of Babhrubahana, king of kalinga. It must therefore have been situated somewhere in the south of Orissa or north of Madras. Various sites in that tract have been suggested by Lassen, Oppert and others. Its exact position is still uncertain, but there can be no doubt whatever that it was nowhere near the place of the same name in Assam. Gaits' Assam Page—270.

রাজত্ব করিতেন, তিনি নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিয়া ইংরাজ রাজের শরণ লইলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহের সহিত ইংরাজ রাজের মিত্রতা স্থাপিত হইল। এই মিত্রতার ফলে মিঃ ভের্লষ্ট চট্টগ্রাম হইতে একদল ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা বদরপুরের কাছাকাছি খাসপুরে পৌঁছিবার পর হইতে এমন বর্ষা দেখা দিল এবং পীড়ার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল যে তাঁহারা বরাক নদীর তীরবর্ত্তী জয়নগর নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন—সেখান হইতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। এ সময়ে রাজা জয়সিংহ ইংরাজদের কাছে এক পত্র দিলেন যে তাঁহার এখন টাকা দিবার কোন ক্ষমতা নাই,—বর্মনেরা রাজকোষ শূন্য করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার রাজ্যের কৃষিজাত ফসল ব্যতীত অন্য কিছুই নাই!—যে কারণেই হউক ইংরাজদের সৈন্য-সাহায্য আর রাজা জয়সিংহকে গ্রহণ করিতে হয় নাই।

ব্রহ্মবাসীদের সহিত জয়সিংহের গোলযোগ

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্মনরা পুনরায় মণিপুর রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিল। এসময়ে জয়সিংহ মণিপুরের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। এবার বর্মনদের আক্রমণে কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। মানেরা চলিয়া গেলে মানেরা যাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় মণিপুরের সিংহাসনে বসিলেন।—এসময়ে হঠাৎ আবার মানেরা মণিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আহোম-রাজা রাজেশ্বর সিংহের সাহায্যে তিনি সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই চৌদ্দ বৎসর কাল তাঁহাকে চারিবার রাজসিংহাসন হইতে বিতাড়িত

হইতে হইয়াছিল। শেষটায় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মণিপুর-রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। তাই আমরা দেখিতে পাই ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়সিংহ পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারিহাজার পদাতি লইয়া আহোম রাজা গৌরীনাথের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছেন।

জয়সিংহের মৃত্যু ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যু হইল। জয়সিংহ নানাপ্রকার গোলযোগের মধ্য দিয়া চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র হর্ষচন্দ্র রাজা হইলেন। হর্ষচন্দ্র মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন।—হর্ষচন্দ্রের বিমাতার এক ভাই তাঁহাকে গোপনে হত্যা করেন। জয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র মধুচন্দ্র ও পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ঐ ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। তারপর একে একে চৌরজিতসিংহ, মার্জ্জিত সিংহ প্রভৃতি রাজা হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে আভার রাজার সাহায্যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মার্জ্জিত সিংহ অতি নির্দ্দয় ভাবে সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারীদিগকে নিহত করিয়া সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত হইয়া মণিপুরের রাজা হইলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্জ্জিত সিংহ—বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া কাছাড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মানেরা মণিপুর আক্রমণ করে। তখন গম্ভীর সিংহ ইংরাজ-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্য প্রার্থনার ফলে ইংরাজ রাজ তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন এবং মানদিগকে মণিপুর হইতে বিতাড়িত করেন এবং তাঁহাদের রাজ্যের পশ্চিমাংশ মণিপুরের সহিত সংযুক্ত করেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ্যের সহিত সন্ধি হয় এবং তখন মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ব্রহ্মযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীহট্টের ইতিহাস

শ্রীহট্ট এক সময়ে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই অনুমান ছাড়া শ্রীহট্ট সম্বন্ধে প্রাচীনকালের কোন ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় না। শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে নানা শ্রেণীর অনার্য্যজাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্যই ইহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে প্রাচীনকালে বোদোজাতীয় লোকেরা এদেশে বাস করিত এবং বোদো জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে যে বাঙ্গালাদেশে সেনবংশীয় রাজারা যখন রাজত্ব করিতেন, তখন শ্রীহট্ট রাজ্য তাঁহাদের শাসনাধীনে ছিল। ত্রিপুরার রাজারাও সময় সময় শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। ত্রিপুরার রাজারা কেহ কেহ ব্রাহ্মণদিগকে দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেই দানপত্র তাম্রফলকে খোদিত হইয়া প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপ দুইখানি তাম্রফলকে শ্রীহট্ট "ত্রিপুরা পর্ব্বতেশ্বর" কর্ত্তৃক শাসিত হইত এইরূপ জানা যায়। ত্রিপুরা রাজবংশের অষ্টম ও নবম রাজাই শ্রীহট্ট শাসন করেন এইরূপ জানা যায়। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস "রাজমালা" হইতে ইহা জানিতে পারি।

প্রাচীন কালের কথা

চীনদেশীয় পর্য্যাটক ইউয়ানচুয়াং ৬৪০ খ্রীঃ অব্দে আসামে আগমন করেন। তিনি শ্রীহট্টের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে শ্রীহট্ট রাজ্য সে সময়ে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্টের

দক্ষিণের হাওরা (বিল) গুলি দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট (১) গৌড় বা শ্রীহট্ট (২) লাউড় এবং (৩) জয়ন্তিয়াপুর এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই তিন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্তা ত্রিপুরা-রাজের অধীন ছিলেন। পরে কিন্তু ইঁহারা স্বাধীনতালাভ করেন।

গোবিন্দ দেব ও ঈশান দেব

ভাটের বাজার নামক স্থানের কাছে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে একটা রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা শ্রীহট্ট-রাজ গৌরগোবিন্দের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত আছে। সেখানে দুইখানি তাম্রফলক পাওয়া যায়। ঐ তাম্র-ফলকে গোবিন্দের ও তাঁহার পুত্র ঈশান দেব কর্তৃক ভূমিদানের বিবরণ লিখিত আছে। এই রাজংশের বংশাবলী এইরূপ

(১) নবগিরধান বা খরবন

(২) গোকুল

(৩) নারায়ণ

(৪) গোবিন্দ বা কেশবদেব

(৫) ঈশান দেব

এই তাম্রফলক হইতে জানা যায় যে ইঁহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১২৫৩ খ্রীঃ অঃ) রাজত্ব করিতেন। গৌর-গোবিন্দ যখন শ্রীহট্টে রাজত্ব করিতেন, তখন সুলতান সেকেন্দর সাহ বাঙ্গালাদেশের সুলতান ছিলেন। কেহ কেহ এই রাজবংশীয়দিগকে ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া বলেন। রাজা গৌরগোবিন্দ মুসলমান পীর শা—জেলাল কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

মুসলমান কর্তৃক শ্রীহট্ট-বিজয় সম্বন্ধে অনেক গল্পগুজব চলিত

শ্রীহট্টে মুসলমান-বিজয়

আছে। কিংবদন্তী এই যে শা-জেলাল কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজিত হয়। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে তাহা বলা বড় কঠিন। শা-জেলালের শ্রীহট্ট আগমন সম্পর্কেও সন তারিখ লইয়া গোলমাল আছে। এ সম্বন্ধে তুইটী কিংবদন্তী আছে একটী এই যে ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু ঘটে। অপরটি এই যে সুলতান্ আলা-উদ্-দীন্ যখন দিল্লীর সম্রাট (১২৯৬—১৩১৬ খৃঃ অঃ) সে সময়ে শা-জেলাল সুলতান আলা-উদ্-দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দর শাহের নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্যসহ শ্রীহট্টে গমন করেন। এই শেষোক্ত বিবরণটিই সত্য বলিয়া মনে হয়, কেন না ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের একটী খোদিত লিপি হইতে জানা যায়—ফিরোজ শাহ যখন বাঙ্গালার নবাব সে সময়ে শেকেন্দর খান গাজি ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট-জয় করেন।

শা-জেলালের সমাধি-মন্দিরের মধ্যে যে খোদিতলিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ১৪৭৪—১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীহট্ট-বিজয় ঘটিয়াছিল। যে ভাবে যে সময়েই শ্রীহট্ট বিজয় হউক না কেন মোট কথা সে সময়ে গৌড় হইতে জয়ন্তিয়া পর্য্যন্ত মাত্র শ্রীহট্ট রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এখন শা-জেলালের কথা বলিতেছি।

শা-জেলাল—আরব দেশের 'যমান্' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ইব্রাহিম। তাঁহাকে অনেকেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া বলেন। শা-জেলাল কোরেশসম্প্রদায়ের সেখ-পরিবারভুক্ত ছিলেন। তিনি শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া আহম্মদ কবির নামক একজন

সৈয়দ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সৈয়দ সম্পর্কে তাঁহার খুল্লতাত ছিলেন আবার এদিকে একজন দরবেশও ছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ কবির মক্কায় বাস করিতেন। প্রথম বয়সে এই সৈয়দ সাহেবের কাছেই তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা আরম্ভ হয়। এইরূপ গল্প আছে যে শা-জেলাল তাঁহার প্রথম বয়সে একদিন শুধু দৃষ্টি-শক্তি দ্বারা একটী হরিণকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহার দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ দরবেশ ভ্রাতুষ্পুত্রের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ঈশ্বর বালককে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানে যাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য আদেশ করিলেন এবং শা-জেলালের হাতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা তুলিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে "যে স্থানে এই বর্ণ, এই স্বাদ ও এইরূপ গন্ধবিশিষ্ট মৃত্তিকা দেখিতে পাইবে সেখানেই আপনার বাসস্থান স্থির করিবে।"

জেলাল যখন হিন্দুস্থানে আসেন—তখন শ্রীহট্টে গৌরগোবিন্দ নামে একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। তখন শিলেটের নাম ছিল শ্রীহাট বা শ্রীহট্ট। এস্থানে অসভ্য অনার্য্য বন্যজাতিরা বাস করিত। সে সময়ে শ্রীহট্টে দুইচারিজন মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত লোকও দেখিতে পাওয়া যাইত। গৌরগোবিন্দ মুসলমানদের প্রতি বড় একটা ভাল ব্যবহার করিতেন না। মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাহারা উৎপীড়িত হইয়া অন্যান্য রাজ্যে পলায়ন করে। অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান দেশেই রহিয়া গেল, যাহারা দেশে রহিয়া গেল তাহাদের একজনের নাম ছিল সেখ বুরাহনুদ্দী।

সেখ বুরাহন্‌দী ছিল নিঃসন্তান। সে একবার মানস করিল যে যদি তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে তাহা হইলে আল্লার নামে সে একটী গরু জবাই করিবে। এইরূপ মানস করিবার পরে তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। বুরাহন্‌দীও গরু জবাই করিল। রাজা গোবিন্দের কাণে এই সংবাদ গেলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বুরাহন্‌দীকে ধরিয়া গো-হত্যার জন্য তাহার ডান হাতখানি কাটিয়া ফেলিলেন এবং নবজাত শিশুপুত্র-টিকে বধ করিলেন। বুরাহন্‌দী এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য দিল্লীতে যাইয়া সুলতান আলা-উদ্‌-দীনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দর সাহ ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্রের পার দিয়া শ্রীহট্টের দিকে অগ্রসর হইলেন। গৌর-গোবিন্দও প্রস্তুত ছিলেন। এই যুদ্ধে রাজা গৌরগোবিন্দ প্রচুর পরিমাণে 'অগ্নিবাণ' বা হাওই আনিয়াছিলেন। এই অগ্নিবাণে পাঠানদের অশ্বগুলি একান্ত ভীত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। যুদ্ধে হিন্দুরা জয়ী হইলেন, দিল্লীর সেনা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল।

সেখ বুরাহন্‌দীর গল্প

বুরাহন্‌দী দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনিও ঐ সঙ্গে পলায়ন করিলেন।

বুরাহন্‌দী নিরুপায় হইয়া দরবেশ শা-জেলালের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে শা-জেলাল দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন। দিল্লীতে ইঁহাকে সকলেই সাধু-মহাত্মা জ্ঞানে সম্মান করিত। দিল্লী সম্রাটের আধ্যাত্মিক গুরু, শা-জেলালকে কাল রঙের একযোড়া কবুতর দিয়াছিলেন। শা-জেলাল সে কবুতর যোড়া সঙ্গে করিয়া শ্রীহট্ট আসেন। শা সাহেবের দরগায় এখনও বহু কবুতর দেখা

যায়, লোকে বলে ঐ দুই কবুতর হইতেই এসকল কবুতরের জন্ম।

সৈয়দ নাসির নামক একজন সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে সুলতান আলা-উদ্-দীন পুনরায় শ্রীহট্ট-জয় করিবার জন্য একদল সেনা পাঠাইয়া দিলেন। শা-জেলালও এই সেনার সঙ্গে চলিলেন। কথিত আছে সেনাদল ব্রহ্মপুত্রের তটে পৌঁছিলে জেলাল তাঁহার সাধনার আসন বা চাটাইতে চড়িয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া শা সাহেব শিষ্যগণসহ নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইবার রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। সাধুর আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। রাজা সকলের পরামর্শানুযায়ী এইবার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। প্রথমতঃ রাজার প্রতি একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ উপযোগী প্রস্তর যোগাইবার আদেশ করা হইল, পরে সমস্ত রাজ্য ব্যাপিয়া মস্‌জিদ নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইয়াছিল!

সম্রাট্ আলা-উদ্-দীনের পুনরায় শ্রীহট্টে সৈন্য প্রেরণ

শা-জেলাল সুর্ম্মা নদীর পরপারে যাইয়া সেখানকার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলেন। তিনি মক্কা হইতে যে মাটি আনিয়াছিলেন, সেখানে সেই রঙ, সেই গন্ধ ও সেই আস্বাদ-যুক্ত মৃত্তিকা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—“আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।” এইরূপ বলিয়া শা-জেলাল সুর্ম্মানদীর পরপারে আপনার “আস্তানা” বা বিশ্রাম স্থান প্রস্তুত করিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে সেকেন্দর সা ঐ রাজ্যের রাজা নিযুক্ত হইলেন। শা-জেলালের সঙ্গে ৩৬০ জন দরবেশ আসিয়াছিলেন—এই দরবেশেরা এইবার চারিদিকে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে

মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। এই দরবেশেদের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে। শা-জেলাল অতি বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করেন।

ই'বু বাটুটার শ্রীহট্ট-ভ্রমণ-কাহিনী

আবুআবদুল্লীমহম্মদ একজন সুবিখ্যাত মুসলমান পরিব্রাজক। তিনি "ইবুবাটুটা" বা পর্য্যাটক নামেই অধিকতর পরিচিত। ইবুবাটুটা মহাপুরুষ শা-জেলালকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীহট্টে গমন করেন। পরিব্রাজক তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে "তাব্রিজের শাজেলাল" সাধু এইরূপ নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে—"শা-জেলাল সাধু তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বহু অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স তখন একশত বৎসর হইবে। আকৃতি সুদীর্ঘ কিন্তু ক্ষীণ। তিনি গুহার ভিতরে বাস করিতেন। দশদিন ক্রমাগত উপবাসের পর তাঁহার রক্ষিত একটী গাভীর কিঞ্চিৎ পরিমাণ দুগ্ধ মাত্র পান করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাধুকে দর্শন করিতে আসিয়া নানাবস্তু আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিত। কোন্ দিন কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। শা-জেলালের মৃত্যুর পর "শা জেলালের দরগা" নামক মন্দিরে তাঁহার সমাধি হয়। মুসলমানদের নিকট ইহা অতি পবিত্র তীর্থস্থান।

লাউড়ের রাজার পরাজয়

এ সময়ে লাউড় কিংবা জয়ন্তিয়া মুসলমানদের করতলগত হয় নাই। বর্ত্তমান শ্রীহট্টের পশ্চিম ও উত্তরাংশে লাউড় রাজ্য বিদ্যমান ছিল। মোগলসম্রাট্ আকবরের শাসনকালে লাউড়-রাজ মোগলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন।

সীমান্তের পার্ব্বত্যজাতিদের অত্যাচার হইতে রাজ্য রক্ষার ভার সম্রাট্ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লাউড় রাজের নিকট হইতে কোনরূপ কর গ্রহণ করেন নাই। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তৎকালীন লাউড়ের রাজা গোবিন্দ, সম্রাট্ কর্ত্তৃক দিল্লীতে আহুত হন, সেখানে যাইয়া তিনি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র, রাজধানী বাণিয়াচঙ্গ নামক সমতলভূমিতে স্থানান্তরিত করেন। খাসিয়াদের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য বাণিয়াচঙ্গে দুর্গাদি'ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। জয়ন্তিয়া রাজ্য ব্রিটিশ-শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে লাউড়-রাজপরিবারের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় লাউড়, জগন্নাথপুর ও বাণিয়াচঙ্গ এই তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং লাউড়ের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানবংশ বিশেষ বিখ্যাত।

ত্রিপুরারাজ্য ও মুসলমান সংঘর্ষ

ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস বেশ ভাল করিয়া জানা যায় না। ত্রিপুরা রাজাদের ইতিহাস 'রাজমালায়' ত্রিপুরা রাজাদের দ্বারা মুসলমানদের অনেক পরাজয়ের কথা আছে এমন কি তাঁহারা শ্রীহট্ট-বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে। শেষবার কিন্তু ত্রিপুরা-রাজকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং মুসলমানদিগকে কর দিতে হইয়াছিল।

মোগল শাসনাধীনে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা

বাঙ্গালাদেশ যখন স্বাধীন সুলতানগণের শাসনাধীনে ছিল তখন শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণের উপাধি ছিল নবাব। মোগল শাসনাধীনে আসিবার পর যাঁহারা শ্রীহট্ট শাসন করিতেন তাঁহারা "আমিল" নামে পরিচিত ছিলেন। এই আমিলেরা

ঢাকার নবাবের অধীনে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সাধারণতঃ ইঁহারা শ্রীহট্ট অঞ্চলে নবাব বলিয়াই পরিচিত হইতেন। আমিলেরা ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইতেন। প্রায় চল্লিশজন আমিল শ্রীহট্ট শাসন করেন। ফসাদখাঁন নামক একজন আমিল,—শ্রীহট্ট রাজ্যের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অনেক সুন্দর সুদীর্ঘ রাজপথ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফসাদখাঁন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহট্ট রাজ্য শাসন করেন।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃভূমি। বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীঅদ্বৈতগোস্বামীর জন্মভূমিও শ্রীহট্টেই ছিল। বৈয়াকরণিক বাণীনাথ বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য বহু সুপরিচিত বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রীহট্ট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংরাজ অধিকার রবার্ট লিণ্ড্সে

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানী বাঙ্গালা বিহারও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট সে সময়ে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল কাজেই ঐ সঙ্গে শ্রীহট্ট ও ইংরাজাধিকারে আসিল। ইংরাজ অধিকারে আসিলে এই জেলা, ঢাকা বিভাগের কমিশনারের উপর অর্পিত হইল। প্রায় তেরো বৎসর পরে রবার্ট লিণ্ড্সে নামক একজন সাহেব এই জেলার কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। লিণ্ডসে সাহেব এখানে আসিয়া দেখিলেন যে শ্রীহট্টে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন নাই। কড়িই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। শ্রীহট্টের রাজস্ব ২,৫০,০০০ টাকা সমুদয় কড়ি দিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ রাজস্বের উপযুক্ত পরিমাণ কড়ি ঢাকাতে পাঠান বড় সহজ ছিল না। ঢাকায় এই রাজস্বের কড়ি নীলামে বিক্রয় হইত তাহাতেও প্রায়

শতকরা দশটাকা ক্ষতি হইত। সেকালে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকারও দেওয়া হইত। মিঃ লিণ্ডসে একজন খাসিয়া সর্দ্দারের নিকট হইতে চেরাপুঞ্জির নিকটবর্ত্তী স্থানের চূণের পাহাড়ের ইজারা লইয়া চূণের রপ্তানী দ্বারা প্রচুর অর্থলাভ করেন। লিণ্ডসে অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন,—তিনি নীল, কাফিও গুটিপোকার চাষ করিয়া দেশের লোকের ধন-বৃদ্ধির পথ দেখাইয়া দেন। স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে তিনি গমের বীজ বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গমের চাষ সম্বন্ধে কোনরূপ যত্ন করেন নাই। লিণ্ডসের সময়ে দেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল, ফসলও বেশ ভাল জন্মিত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট অঞ্চলে এক ভীষণ বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার ফলে এমন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

রবার্ট লিণ্ডসের পর জন্‌উইল্‌স্—শ্রীহট্টের কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে খাসিয়াগণ ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নামক স্থান আক্রমণ করিয়া বহুলোকের প্রাণনাশ করেন জন্‌উইলল্‌স্ সাহেব শ্রীহট্ট হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। লর্ডকর্ণওয়ালিস্ যখন ভারতবর্ষের গভর্ণরে জেনারেল ছিলেন তখন তিনি বঙ্গদেশের সহিত আসামের শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া জেলায় চিরস্থায়ীবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

প্রথম অবস্থায় পশ্চিমদেশীয় প্রায় শতাধিক সিপাহী শ্রীহট্টে বাস করিত। কিন্তু এ দেশের জলবায়ু তাহাদের সহ্য হইত

না অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত এইজন্য স্থানীয় সুস্থ ও সবল লোক বাছিয়া এক দেশীয় সৈন্যদল গঠন করেন। এই অল্প সংখ্যক সৈন্যদল লইয়াই তিনি কোনরূপ বিপদ বা দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে শাসন-সংরক্ষণ করিতেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বর্ম্মা কর্ত্তৃক আসাম আক্রমণ ও আসামে ইংরাজ শাসনের প্রবর্ত্তন

ব্রহ্মবাসীরা যদি আসাম প্রদেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন তাহা হইলে আসামের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত। পুরন্দরসিংহের পর চন্দ্রকান্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই ব্রহ্মবাসীদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার ফলে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীরা চন্দ্রকান্তকে আসাম হইতে তাড়াইয়া দিয়া সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন।

ইংরাজ ও ব্রহ্মবাসী

নিরুপায় চন্দ্রকান্ত পলায়ন করিয়া ইংরাজ-অধিকারে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে বহু আসামী সম্ভ্রান্ত জাতি আসিয়াও ইংরাজ-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সুযোগে মানেরা ঐ সকল দেশত্যাগী আসামবাসীদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং আসামবাসীদের উপর ঘোরতর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। আবার এদিকে ব্রহ্মসৈন্যগণের অধিনায়ক ইংরাজ সেনাপতিকে ভীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন যে—যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চন্দ্রকান্তকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ না করেন তাহা হইলে তাঁহারা ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক চন্দ্রকান্তকে ধরিয়া আনিবেন।" এইরূপ পত্র প্রেরণ করিবার পরেই একদল ব্রহ্মদেশীয় সেনা কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। এই সময়ে কাছাড় রাজ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসিত হইতেছিল। প্রথমতঃ ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রহ্মসৈন্যগণকে কাছাড়

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইহার ফলে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে ব্রিটিশ-গভর্মেণ্ট ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। ইংরাজসৈন্যগণ ব্রহ্মদেশীয় সেনাদের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহারা পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ সময়ে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য ছিলমাত্র দুইহাজার আর বাকী আসামী ও কাছাড়ী সৈন্য লইয়া ব্রহ্মসেনাপতি যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। বরাক নদীর তীরে, জটিঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী ভার্ত্তিকা নামক স্থানে ইংরাজদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়দের যুদ্ধ হইয়াছিল—এই সকল যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইয়া দুর্গম পাহাড়ে যাইয়া লুকাইয়া থাকিত। ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ গোয়ালপাড়া হইতে সংগৃহীত এক বহর কামানের নৌকাযোগে সমস্ত ব্রহ্মপুত্রউপত্যকা জয় করিয়া লইলেন।

তাহার পর ব্রিটিশ সৈন্যগণ—গৌহাটিতে যাইয়া ছাউনি গাড়িয়া রহিল। গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটি যাইতে সেকালের দুর্গম বনজঙ্গল ও পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিতে তাহাদের পনেরো দিন লাগিয়াছিল। পথ-ঘাট, রসদ এবং শত্রুগণের কার্য্যকলাপের বিবরণ সম্যক্ জ্ঞাত না হইয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়াই ইংরাজ সৈন্যদিগকে অনেকটা দিন গৌহাটিতে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এ সময়ে ডেভিড্ স্কট্ (David Scott) নামে একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান্ গৌহাটিতে গভর্ণর জেনারেলের "এজেণ্ট"রূপে কাজ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনিও বেশ সাহসিকতার এবং সৈন্য পরিচালন-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

এদিকে ব্রহ্মদেশীয়েরা—আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া কালিয়াবরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য গৌহাটি হইতে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। ইংরাজ সৈন্যেরা পৌঁছিলে পর তাহারা রঙ্গলিগরের দিকে পিছু হটিয়া গেল।

কর্ণেল রিচার্ডস্ (Colonel Richards) ইংরাজ সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি কলিয়াবরে শিবির-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এ সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় রসদ ইত্যাদি অসুবিধাজনক হইয়া পড়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া গৌহাটি ফিরিয়া আসিতে হইল। ব্রহ্মবাসীরা এই সুযোগে কলিয়াবর এবং রাহাও নওগাঁ অধিকার করিয়া বসিল। আসামীরা ইংরাজ সৈন্যদিগকে সাহায্য করার দরুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রহ্মবাসীরা আসামীদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সে অমানুষিক নির্য্যাতনের কথা অবর্ণনীয়। জীবিত মানুষের গাত্র-চর্ম্ম উৎপাটন করিয়া, গায়ে উত্তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিয়া আসামীদিগকে ইহারা নিহত করিয়াছিল। গ্রাম্য "নামঘর" বা উপাসনাগৃহ জ্বালাইয়া দিয়াও শত শত নিরীহ গ্রামবাসিদিগকে হত্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মসৈন্যদের এইরূপ অমানুষিক নির্য্যাতনের ভয়ে দলে দলে আসামের প্রাচীন অধিবাসীরা দুরধিগম্য পর্ব্বত-গুহায় এবং বনে-জঙ্গলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, সেখানেও অনাহারে এবং বিবিধ প্রাণনাশকারী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদের প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। এইরূপ-ভাবে মানদের অত্যাচারে—আসামের অনেক প্রদেশ একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অতি অল্পসংখ্যক আসামীরাই

ব্রহ্মসৈন্যদের দ্বারা আসামীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার

প্রাণরক্ষা করিয়া সুরমাউপত্যকার সমতলভূমিতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের মগদের উপদ্রবের ন্যায় আসামের লোকের কাছে এখনও মগদের এই নির্য্যাতনের কথা চিরজাগ্রত হইয়া আছে। বর্ষা কাটিয়া গেলে ব্রিটিশসৈন্যেরা পুনরায় ব্রহ্মবাসীদের বিরুদ্ধে রণাভিযান করিলেন। কাপ্তান নিউফ্‌ভিল্ (Captain Neufvile) নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতির পরিচালনায় ব্রিটিশ-সৈন্য মগদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া প্রায় ছয় হাজার আসামী-বন্দীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া ব্রিটিশ সৈন্য কাছাড় ও মণিপুর অঞ্চল হইতেও মানদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জান্দাবুর সন্ধি ১৮২৬-২৪শে ফেব্রুয়ারী

মণিপুরের গম্ভীরসিংহ, ইংরাজ সৈন্যের সহযোগীতায় মণিপুর হইতে সম্পূর্ণরূপে মানদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে—জান্দাবু নামক স্থানে উভয়-পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ব্রহ্মবাসীরা আসাম রাজ্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর আসামের একাংশ অর্থাৎ কামরূপ, নওগা ও দারবাঙ্গ এই কয়টি জেলা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন করা হইল। ডিব্রুগড় জেলায় মোয়ামারিগণ বাস করিত। উহা কয়েক বৎসর কাল মোয়ামারিয়াদিগের দলপতি 'বর সেনাপতির' অধীনে রাখা হইয়াছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, বর সেনাপতির মৃত্যু হয় এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডিব্রুগড় ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইয়া যায় প্রথম অবস্থায় শিবসাগর ও লক্ষীমপুর জেলাদ্বয় রাজা পুরন্দর

সিংহের হাতে রাখা হইয়াছিল। তিনি ৫০০০০৲ টাকা রাজস্ব দিতে সম্মত হইয়া উহা রাখিয়াছিলেন। পরে তিনি জেলা দুটী শাসন করিতে অসমর্থ বলিয়া প্রকাশ করায় এদুটী জেলাও ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। সামীর জেলা খাম্‌পতি সর্দ্দারের হাতে ছিল। খাম্‌পতিগণ বিদ্রোহী হওয়াতে এই সময়ে সামীর জেলাও ব্রিটিশরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র আসাম রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। গোয়ালপাড়া লইয়া আসাম প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপে বাঙ্গালারাজ্যের অধীন ছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ আলম্ ইহা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উহা দান করেন। পূর্ব্বে দুয়ার হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভুটান যুদ্ধের অবসানে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট উহা ভুটানের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লন।

ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট প্রথমতঃ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশের শাসন-সংরক্ষণে মনোযোগী হইলেন। মানেরা ঐ অঞ্চলে অনেকদিন অবস্থান করায় এখানকার বিধি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

ডেভিড্ স্কট্ এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

এই অঞ্চলের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থাও শাসন-সংরক্ষণের ভার ডেভিড্ স্কট্ নামক একজন যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হইল। ডেভিড্ স্কট্ গভর্ণার জেনারেলের এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার উপর কাছাড়, শ্রীহট্ট এবং সিকিমের সীমান্ত শাসন-সংরক্ষণের ভার দেওয়া হইল। এই সময়ে ডেভিড্ স্কট্ নানাপ্রকার কার্য্যের দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এত বড় একটা বিস্তৃত

প্রদেশের শাসন কার্য্য বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি একাই সুসম্পন্ন করেন পরে তাঁহার সাহায্যার্থ কাপ্তান হোয়াইট্ নামক এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। এতবড় একটা প্রদেশের সংস্কার করা একা একজনের পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে, তথাপি সদাশয় স্কট সাহেব অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলের অনেক কল্যাণজনক কার্য্য সম্পন্ন করেন। আহোমদের দাসত্ব প্রথা রহিত করেন। সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি সমগ্র রাজ্যটিকে কয়েকটি মৌজায় বিভক্ত করেন। এবং প্রত্যেক মৌজায় এক একজন মৌজাদার নিযুক্ত করিয়া সরকারি রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। এই সকল কর্ম্মচারীরা. মৌজাদার, চৌধুরি, পাটগিরি, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হইতেন। জরিপ কার্য্য ও তাঁহার চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়। এ সময়ে ভিটাবাড়ী বস্তি, ধান চাষের জমি 'রুপিত' ফারিজাতি (সরিষা প্রভৃতি শস্য যে জমিতে উৎপন্ন হইত) এইরূপ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া জরিপ হইয়াছিল। সাধারণ মাম্‌লা মোকদ্দমা দেওয়ানী ও ফৌজদারী পঞ্চায়েতদের দ্বারা নিষ্পত্তি হইত।

গারো জাতির উন্নতি কল্পে স্কট্ সাহেব নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগে গৌহাটী হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আসামের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এইরূপ নানাকার্য্য করিতে যাইয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে চেরাপুঞ্জিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁহার সমাধির গায়ে তদীয় কার্য্য-বিবরণী লিখিত আছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনমাস মাত্র হইয়াছিল।

ডেভিট্‌স্কটের মৃত্যুর পর রবার্টসন্ (T. C. Robertson) সাহেব

পুরন্দরসিংহ

তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা শিবসাগর ও লক্ষীমপুর জেলার উত্তরাংশ পুরন্দরসিংহকে ছাড়িয়া দেন। গভর্মেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবার সময় রবার্টসন্ সাহেব পুরন্দরসিংহের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে "পুরন্দরসিংহ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তাঁহার ব্যবহার অতি সুন্দর। চেহারা দেখিয়া মনে হয় যে বেশ কাজের লোক।" পুরন্দর বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা কর দিতে সম্মত হন। ঐ দুই জেলায় আনুমানিক রাজস্ব ১,২০,০০০ আদায় হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল। পুরন্দরসিংহ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর দিতে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ অধিকারে আসিল।

ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট এসময়েও মাটক এবং সদিয়ার সর্দ্দারদের সহিত রাষ্ট্রিয় মিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সদিয়ায় একদল সৈন্য এবং একজন পলিটিকেল অফিসার থাকিতেন। জোরহাটে রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানেই পলিটিকেল এজেণ্ট থাকিতেন। সৈন্যদের ছাউনি বা সৈনিকাবাসও এখানেই হইল।

জেলা সংগঠন

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ রবার্টসন্ কমিশনার এবং এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ব্রিটিশ শাসনভুক্ত আসামপ্রদেশ গোয়ালপাড়া, কামরূপ দারঙ্গ এবং নওগাঁ এই চারিটি জেলায় বিভক্ত হইল। সমস্ত বিভাগ ইংরাজাধিকারে না আনিয়া ধনশ্রী নদীর পূর্ব্বভাগ ধুরন্ধর-সিংহের শাসনাধীন করা হইল। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের পথঘাট ইত্যাদির সংস্কারের এবং স্থলপথেও জলপথে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা হইল।

প্রথম অবস্থায় ইংরাজাধিকৃত আসামঅঞ্চল বঙ্গদেশের কমিশনারের শাসনাধীন ছিল পরে সুশাসনের জন্য ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে

এই প্রদেশের শাসনভার একজন চীফ্ কমিশনারের হস্তে প্রদত্ত হয়।

শিলং পাহাড়ে স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইল। শিলং পার্ব্বত্য শোভা-সম্পদে ও স্বাস্থ্য গৌরবে অতি রমণীয় প্রদেশ। ইহার চারিদিক বেড়িয়া নীলপর্ব্বত-শ্রেণী তরু-লতা-গুল্মসমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া আছে। একে একে কাছাড়, জয়ন্তিয়া, প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সদিয়ার শাসনকর্ত্তা ক্ষোয়াগোহেইনের মৃত্যুর পর সদিয়ারাজ্যে বিবিধ গোলযোগের উৎপত্তি হয়—অবশেষে ইংরাজরাজের সঙ্গে কলহের সৃষ্টি হয়। অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মাটক এবং সদিয়া ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়া লক্ষীমপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইল।

কর্ণেল কিটিং আসামের সর্ব্বপ্রথম চীফকমিশনার নিযুক্ত হইলেন। (১৮৭৪-১৮৭৮)। খাসিয়াপাহাড়ের উপরিস্থিত শিংল নামক সুন্দর পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজধানী স্থাপিত হইল। ভারতের বড়লাট প্রাদেশিক শাসন ও স্থানীয় আইন গঠনের ভার চীফ কমিশনারের উপর অর্পণ করিলেন।

মণিপুরের যুদ্ধ

কিটিং সাহেবের পরে একে একে বেলি, ইলিয়ট, ওয়ার্ড, ফিট্জপাট্রিক প্রভৃতি চীফ কমিশনারের শাসনকালে আসাম প্রদেশ বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। কুইণ্টন সাহেব ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিশনার নিযুক্ত হন। তাঁহার সময় বিখ্যাত মণিপুর যুদ্ধ হয়। মণিপুর পর্ব্বতময় প্রদেশ। পর্ব্বত শাখাগুলি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এখানকার সকলের চেয়ে উচু পাহাড় ৮০০০ ফুটের অধিক নহে।

পর্ব্বতশ্রেণী যতই দক্ষিণে গিয়াছে ততই ক্রমশঃ নীচু হইয়া গিয়াছে। শেষে চট্টগ্রাম হইয়া আরাকানের কাছে গিয়া একেবারেই নত হইয়া পড়িয়াছে।

মণিপুরের প্রাচীন সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণার জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধ উপলক্ষে ব্রহ্মসেনা কাছাড়, আসাম এবং মণিপুর আক্রমণ করে। তখন গম্ভীরসিংহ মণিপুরের রাজা। তিনি ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, ইংরাজ ও কয়েকজন সিপাহী ও কয়েকটা কামান পাঠাইয়া দিলেন, আর মণিপুরী-দিগকে লইয়া একটী সৈন্যদল প্রস্তুত করিলেন। সেই সেনাদলে ইংরাজ সেনানীদিগকে নিযুক্ত করা হইল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ থামিয়া গেল; মণিপুর ও ব্রহ্মার অধীনতা হইতে মুক্ত হইল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ ঘটিল না। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গম্ভীরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি তখন এক বৎসরের শিশু, সুতরাং গম্ভীর সিংহের ভ্রাতা নরসিংহই আধিপত্য করিতে লাগিলেন। মণিপুরের অধিকৃত কিয়দংশ ব্রহ্মরাজ্য ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ব্রহ্মরাজকে ফিরাইয়া দেন, কিন্তু তাহার খাজনা স্বরূপ বৎসর ৬৩৭০ টাকা ইংরাজ মণিপুর রাজকে দিতেন। ইংরাজ ব্রহ্মের সেই রাজ্যাংশটুকুর জন্য মণিপুরকে বৎসর ৬৩৭০ টাকা দিতে থাকিলেন এমন নহে, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরে একজন ব্রিটিশ পলিটিকেল এজেণ্ট রাখিবার ব্যবস্থা হইল। নরসিংহ নির্ব্বিঘ্নে ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন এমন সময়ে ১৮৪৪ সালে তাঁহার প্রতিকূলে একটা ষড়যন্ত্র হইল। বালকরাজা চন্দ্রকীর্ত্তির জননীকেও সেই ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত বলিয়া

স্থির করা হইল, সুতরাং তাঁহাকে পুত্র লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসিতে হইল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রসিংহই রাজা হইলেন। ইংরাজও তাঁহাকেই মণিপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনমাস যাইতে না যাইতেই, প্রকৃত রাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সসৈন্যে মণিপুরের দিকে অভিযান করিলেন; তখন দেবেন্দ্রসিংহ কাছাড়ে পলাইয়া আসিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তি পৈত্রিক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, ইংরাজও তাঁহাকে ১৮৫১ সালে মণিপুরের রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। ১৮৭৯ সালে ইংরাজ যখন নাগা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন চন্দ্রকীর্ত্তি ইংরাজের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। নাগারা যখন ইংরাজের কহিমাদুর্গ আক্রমণ করে তখন চন্দ্রকীর্ত্তি সৈন্যদ্বারা ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজও তাঁহাকে কে, সি, এস্. আই উপাধি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র রাজা হইলেন। চন্দ্রকীর্ত্তির দুই বিবাহ ছিল। তাঁহার দুই পক্ষে নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথমপক্ষের শূরচন্দ্র রাজা হইয়া জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় কুলচন্দ্রকে মন্ত্রী করিয়াছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ কালে নরসিংহের পুত্র বড় চাউবাসিংহ বিদ্রোহী হন, শূরচন্দ্র তাঁহাকে পরাজিত করেন। মধ্যম টিকেন্দ্রজিৎকে সেনাপতি করেন। তিন বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য পরিচালিত হয় কিন্তু পরে শূরচন্দ্রকে মধ্যম বৈমাত্রেয় টিকেন্দ্রজিতের বিদ্বেষভাজন হইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হয়। শূরচন্দ্র শিলচরে আসিয়া পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমিউড্ সাহেবের কাছ হইতে সিংহাসন ত্যাগের পত্র পান। শূরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বড়লাটের কাছে আশ্রয় লইলেন। তিনি

ইংরাজ রাজের সাহায্যে পৈত্রিক সিংহাসন পুনরধিকার করিবেন বলিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। এদিকে ব্রিটিশ গভমের্ণ্ট সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে তাঁহার অন্যায় আচরণের জন্য তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। মণিপুর রাজ্যের সহিত আসাম গভমের্ণ্টের সাক্ষাৎ রাজনৈতিক সম্বন্ধ বলিয়া চীফ কমিশনার কুইণ্টনের উপর এবিষয়ে কি কি করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বড়লাট তাঁহাকে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিলেন। কুইণ্টন মণিপুরে যাইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পলিটিকেল এজেণ্টের বাড়ীতে বসিয়া একটী দরবার আহ্বান করিলেন। দরবারে বর্ত্তমান রাজা কুলচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি হাজির হইলেন না। টিকেন্দ্রজিতও আসিলেন না। বলা বাহুল্য চীফ কমিশনার কুইণ্টনের সহিত বহু গুর্খা সৈনিক, সেনাপতি ও ডাক্তার ইত্যাদিও গিয়াছিলেন। কুইণ্টনের আদেশে কর্ণেলস্কীন্ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধ-সজ্জা করিলেন। রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে যাইয়া ইংরাজের সেনা ও সেনানীরা মণিপুরী সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে অতর্কিত আক্রমণের পরিণাম অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল! চীফ কমিশনার কুইণ্টন, তাঁহার পার্শ্বচর কজিন্স, মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিম্‌উড্, কর্ণেলস্কীন তাঁহার সহকারী সিম্‌সন এবং টেলিগ্রাফের মেনডিল্ ওব্রিয়েন্ প্রভৃতি কয়েকজন সাহেবকে মণিপুরে প্রাণ দিতে হইল।

ব্রিটিশসিংহ ইহার প্রতিশোধ লইলেন। মণিপুরের বিরুদ্ধে ইংরাজ রণাভিযান প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে মণিপুরিরা পরাজিত

হইলেন। রাজা কুলচন্দ্র যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ধৃত ও বন্দী হইলেন। বিচারে টিকেন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইল এবং কুলচন্দ্রসিংহ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইলেন। মণিপুর রাজ্য সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। চূড়ানন্দ নামক রাজবংশীয় কুমার মণিপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণার স্যার ল্যান্সলেট্ হেয়ার মহোদয় তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মণিপুর রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থার জন্য সেখানে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। মণিপুর বর্ত্তমানে ইংরাজ-রাজের করদরাজ্য। ইম্‌ফল নামক নগর মণিপুরের রাজধানী। ইহা একটী হ্রদের তীরে খুব সুন্দর স্থানে অবস্থিত।

চীফ্ কমিশনার স্যার এইচ্, জে, এস্, কটন, কে. সি. আই. আই.

কুইন্টন সাহেবের পর স্যার ওয়ার্ড সাহেব আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন (১৮৯১—১৮৯৬)। তাঁহার পরে স্যার হেন্‌রী কটন্ আসামের চীফকমিশনার নিযুক্ত হইলেন। কটন সাহেবের নাম আসামবাসীদের কাছে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কটন সাহেব আসামের শিক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসামবাসীরা বি. এ. এম. এ. ও আইন পড়িবার জন্য বঙ্গদেশে আসিতেন, কটন সাহেব এই অভাব দূর করিবার জন্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটি সহরে কটন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে আসাম বিস্তৃত প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সুরমা উপত্যকা, উপর আসাম, (Upper Assam) মণিপুরের পার্ব্বত্যপ্রদেশ সমূহ লইয়া এক বিরাট প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

কটন সাহেবের পরে আসামের চীফ্ কমিশনার হইলেন স্থার ব্যামফিল্ড ফুলার। তিনি তিন বৎসরকাল চীফ কমিশনার ভাবে আসামপ্রদেশ শাসন করেন। এ সময়ে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তদানীন্তন ভারতের গভর্ণারজেনারেল লর্ড কার্জ্জনের আদেশে ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং মালদহ জেলার কিয়দংশ দার্জ্জিলিং ছাড়া সমুদয় প্রদেশ আসামের সহিত সম্মিলিত হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে একটী প্রদেশ সংগঠিত হইল। আসামের চীফ্ কমিশনার স্থার ব্যামফিল্ড ফুলার এই নবগঠিত প্রদেশের প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণার নিযুক্ত হইলেন। ঢাকা হইল রাজধানী। ফুলার সাহেবের চেষ্টায় শিলচরে একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইল। স্থার ব্যাম-ফিল্ড ফুলারের পর স্থার ল্যান্সলেট্ হেয়ার সাহেব (১৯০৬-১৯১১) পর্য্যন্ত এই প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৎপরে সার চার্লস বেলি (১৯১১-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ প্রদেশের ল্যাফ্‌টেনাণ্ট গভার্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশ গঠন সময়ে অর্থাৎ এইরূপভাবে বঙ্গ-বিভাগ কালে দেশমধ্যে প্রবল উত্তেজনার ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র সভা-সমিতি ও লর্ড কার্জ্জনের এইরূপ প্রদেশ গঠনের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক কালে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে এক বিরাট দরবার হয়। ভারতবর্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরীর ভারতে আগমনকরায় সর্ব্বত্র আনন্দ ও

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লী দরবার

রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল। সেই দরবারে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণাবলে আবার আসাম, বঙ্গদেশ হইতে পৃথক হইল। বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এবং দ্বিতীয় কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে স্থানান্তরিত হইল। বঙ্গের বিভিন্ন অংশ পুনরায় সংযুক্ত হইল। আসাম লইয়া একটী এবং বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া আর একটী নূতন প্রদেশও গঠিত হইল। যুক্ত বঙ্গ "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" নামে অভিহিত হইল এবং একজন গভর্ণার নিযুক্ত হইলেন। স্যার আর্চ্চডেল আর্ল আসাম প্রদেশের চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। (১৯১২—১৯১৮)।

আবর-অভিযান

স্যার আর্চ্চডেল আর্লের শাসন-কালে সদিয়ার নিকটবর্ত্তী পাহাড় অঞ্চলের আবর নামক পার্ব্বত্য জাতিরা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। আসামের উত্তর পূর্ব্বস্থিত সীমান্ত ভূভাগ ও লক্ষীমপুর জেলার কিয়দংশ লইয়া "উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ" (North Eastern frontier province) গঠন করেন এবং এই প্রদেশের দুই অংশে দুইজন পলিটিকেল অফিসারের শাসনাধীন করেন। তিনি শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজকে উচ্চ শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করেন। তাঁহার শাসন সময়ে একটী প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটে। স্থানে স্থানে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি সরকার হইতে ঋণ দিয়া, খাজনা দেওয়ার জন্য সময় বাড়াইয়া দিয়া প্রজাসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ক্ষিপ্ত কুকুর ও শৃগালের দংশনের চিকিৎসার জন্য তিনি শিলং সহরে পাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। শিলংএ একটী স্বাস্থ্যনিবাসও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর

স্যার আর্চ্চ-ডেল আর্লের শাসনকালেই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর সংগঠিত হইয়াছিল। এ সময়ে লর্ড হার্ডিং ভারতবর্ষের গভর্ণার জেনারেল ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ইউরোপ কেন সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া এক ভয়ানক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সৈন্যগণ বাঙ্গালী সৈন্যগণ এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশের পক্ষ হইয়া অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে সৈন্য ও শ্রমিক সংগৃহীত হইয়া ইউরোপের রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল। মণিপুরের রাজা চূড়চন্দ্র নিজ রাজ্য হইতে দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফরাসী দেশের রণাঙ্গনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ও যুদ্ধ বিজয়ের পর সন্ধিস্থাপন সভায় এবং লিগ্‌অব্‌ নেশান্‌ বা আন্তর্জ্জাতিক মহাপরিষদে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল

স্যার বিট্‌সন বেল ১৯১৮-১৯২১

স্যার আর্চ্চডেল আর্লের পর স্যার বিট্‌সন বেল আসামের চীফ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। এ সময়ে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৬-১৯২০) ভারতবর্ষের গভর্ণার জেনারেল ও ভাইসরয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসনকালে ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কারের একটা পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মহাযুদ্ধের সময় ভারতবাসী ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে সাহায্য করার দরুণ, ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে অনেকটা বেশি পরিমাণ অধিকার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি

দিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতবর্ষে আসিয়া স্বচক্ষে ভারতবর্ষের অবস্থা দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। পরে ভারতবর্ষে কিরূপভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্ত্তন করা যায় সে বিষয়ে বড়লাটের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া "ভারত গভর্মেণ্ট আইন" (Government of India Act 1919) নামে এক নূতন আইন প্রণীত হইল। এই আইনের নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুযায়ীই বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী চলিতেছে। ভারত গবর্মেণ্টের এই আইন অনুসারে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ যেমন গভর্ণারের পদে উন্নীত হইলেন তেমনি **বিট্‌সন বেল** ও আসামের সর্ব্বপ্রথম গভর্ণার হইলেন। বিট্‌সন বেল মাত্র দুইমাস কাল গভর্ণারের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

নূতন বিধান অনুযায়ী আসাম প্রদেশেও একটী ব্যবস্থাপক সভা ও গভর্ণারের শাসন-পরিষদও গঠিত হইল। দুই হইতে চারিজন পর্য্যন্ত সভ্য এবং দুই বা তিনজন মন্ত্রী লইয়া এই শাসন পরিষদ সংগঠিত হইল। সভ্যদের অর্দ্ধেক ভারতবাসী হওয়া চাই, এবং মন্ত্রীগণ সকলেই ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে গভর্ণর মনোনীত করেন। গভর্মেণ্টের বিভাগগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইল। এক বিভাগের নাম হইল "রক্ষিত" (Reserved) আর এক বিভাগের নাম হইল হস্তান্তরিত (Transfered)। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, আবগারী বিভাগ, পূর্ত্ত বিভাগ ইত্যাদি "হস্তান্তরিত"

বিভাগগুলি মন্ত্রীগণের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। পুলিশ, বিচার, খালখনন, সাধারণ শাসনবিভাগ ইত্যাদি রক্ষিত বিভাগগুলি শাসন পরিষদের সভ্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

বিট্‌সন্ বেলের পরে আসামের গভর্ণার হইলেন স্যার উইলিয়ম ম্যারিস। স্যার উইলিয়ম ম্যারিসের পর স্যার জনকার গভর্ণার হইয়াছিলেন তাঁহার শাসনকালে বেশ নিরাপদে ও শান্তিতে আসামের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে।

স্যার উইলিয়ম ম্যারিস ১৯২১ ১৯২৩

বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণরের পদে স্যারজন্ হ্যামণ্ড অধিষ্ঠিত আছেন। মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কারের ফলে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় পূর্ব্বতন নির্দ্ধারণানুযায়ী তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অধিকার ভারতবাসী পাইবার উপযুক্ত কিনা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য লর্ড সাইমন সাহেবের নেতৃত্বে একটী কমিটি গঠিত হয়, এই কমিটির সভ্যগণ ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান পরিদর্শন করেন এবং দেশের লোকের মতামত সংগ্রহ করেন। অনেক ভারতবাসী সাইমন কমিশনকে সমর্থন করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনসাধারণ ভারতবর্ষের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে যেরূপ আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছেন—সাইমন কমিশন তদনুরূপ অধিকার প্রদান পক্ষে অভিমত দিবেন না বলিয়াই এই কমিশন ভারতবাসীর নিকট হইতে সাদরে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন নাই।—সাইমন কমিশন আসামের রাজধানী শিলং সহরেও গমন করিয়াছিলেন।

স্যার জনকার ১৯২৩

সাইমন কমিশন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বর্ত্তমান যুগের প্রধান প্রধান ঘটনা

স্বরমা উপত্যকায় সিপাহী-বিদ্রোহ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। এসময়ে ভাইকাউণ্ট ক্যানিং ভারতবর্ষের বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একটী সামান্য ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া সিপাহীগণ ইংরাজ গভর্মেণ্টের প্রতিকূলাচরণ করে। ইহার প্রধান কারণ সৈন্যদলের মধ্যে এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্ত্তন। এই রাইফেল ব্যবহার করিতে হইলে টোটা ভরিবার পূর্ব্বে তাহার একাংশ দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। সেনাদলের মধ্যে একদল দুষ্ট লোক প্রচার করিয়া দিল যে এ টোটার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই জাতি নষ্ট করিবার জন্য শূকর ও গরুর চর্ব্বি মিশ্রিত হইয়াছে। ইহারই ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। প্রথমে ২৯শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল ক্রমে ক্রমে উহা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় আসাম ইংরাজ শাসনাধীনে ছিল কিন্তু আসাম অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুণ তেমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। আসামেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়াছিল। তাহার ফলে খাসিদের সর্দ্দার এবং জয়ন্তিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা হৃত রাজ্য পুনরু-দ্ধারের জন্য বিবিধ ষড়যন্ত্রের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। স্যার ফ্রেডারিক হেলিডে তখন বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণার ছিলেন। তিনি ঐরূপ জনরবে যাহাতে কোনরূপ অশান্তি না হয় তাহার প্রতিকারের জন্য পূর্ব্ব হইতেই

শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চল সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন। এসময়ে শ্রীহট্টে হে-উড্ সাহেব কালেক্টার ছিলেন। একদল বিদ্রোহী সিপাহী বঙ্গদেশ হইতে সুরমা উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। লাতু নামক স্থান দিয়া বিদ্রোহীসৈনিক-গণ অগ্রসর হইবে জানিতে পারিয়া মেজর বিঙ্গ্ (Major Byng) তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬০ জন আর বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশত। এই আক্রমণে মেজর বিঙ্গ নিহত হইলেন। পরাজিত বিদ্রোহী সিপাহীরা কাছাড়ের জঙ্গলের দিকে পলায়ন করিল। ইংরাজ সৈন্য তাহাদের অনুসরণ করিয়া পরাজিত করিল। অনেক বিদ্রোহী সৈন্য নিহত হইল এবং যাহারা ধৃত হইল বা আত্মসমর্পণ করিল তাহারা উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এসময়ে মিঃ এলেন নামে বোর্ড অব রেভিনিউর একজন সভ্য খাসি এবং জয়ন্তিয়া রাজ্য সম্পর্কিত কার্য্যে আসাম অবস্থান করিতে-ছিলেন, তাঁহার অধিনায়কত্বে এবং পরিচালন গ্রহণে আসাম অঞ্চলে বিদ্রোহ তেমন ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে নাই। মিঃ এলেন তাঁহার কর্ম্মকুশলতার জন্য লেফটেনাণ্ট গভর্ণারের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

ভারতবর্ষের শাসনভার এসময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত ছিল। কোম্পানীর রাজ্যশাসনকালে সিপাহী-বিদ্রোহের ন্যায় গোলযোগ ঘটিতে দেখিতে পাইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন এবং লর্ড ক্যানিং বাহাদুরকে ভারতের সর্ব্বপ্রথম রাজপ্রতিনিধি ভাবে ভারতের শাসনভার অর্পণ করিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের প্রজাগণকে বিজ্ঞাপিত করেন যে তিনি ভারতীয় প্রজাগণও অন্যান্য প্রজাগণের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা করিবেন না। ভারতীয় প্রজাগণের কাহারও ধর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। মহারাণী তাঁহার ঘোষণাপত্রে আরও প্রচার করেন যে ভারতের প্রাচীন আচার ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম এবং দেশ প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথা সমূহের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। আর জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কোনরূপ পক্ষপাত না করিয়া ভারতবাসীদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এই ব্যবহারে ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইল।

শ্রীহট্ট আসাম ভুক্ত হইল

শ্রীহট্ট প্রথম অবস্থায় ঢাকার কমিশনারের শাসনাধীনে ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা একজন কালেক্টার কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই সময় হইতে শ্রীহট্ট আসাম প্রদেশের একটী জেলারূপে পরি-গণিত হইয়া একজন ডেপুটী কমিশনারের শাসনাধীনে রহিয়াছে। জয়ন্তিয়ার সমতলস্থ পরগণাগুলিও শ্রীহট্ট জেলার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে।

জয়ন্তিয়া বিদ্রোহ ১৮৬০-৬২

মিঃ এলেন্ সাহেবের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি খাসি এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসিগণের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সিন্‌টিঙ্গসেরা গভর্মেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইবার জন্য বার্ষিক একটা রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকিবে। তাহাদিগকে কোনরূপ পীড়ন না করিয়া তাহাদের সাধ্যানুযায়ী—বাড়ী বা ঘর প্রতি একটা কর (house tax) এলেন্ সাহেব ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ধার্য্য করিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে পাহাড়িয়ারা বিদ্রোহী হইয়া

উঠিল। অতি সহজেই বিদ্রোহ দমিত হইল। গ্রামবাসীরা ভয়ে চুপ্ চাপ্ করিয়া রহিল। এদিকে গভর্ণমেণ্ট পথ-ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া এবং অন্যান্যরূপ কল্যাণজনক ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইলেন। 'দোলোই' বা গ্রাম্য সর্দ্দারদের উপর গ্রামের রাহাজানি চুরি ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধের কথা পুলিশকে জানাইবার ভার দেওয়া হইল। দোলোইর কার্য্য-ত্রুটির জন্য পদচ্যুতি ঘটিত। এ সময়ে গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় জয়ন্তিয়ার পার্ব্বত্য অধিবাসীদের উপর ও 'আয়কর' (Income tax) প্রবর্ত্তিত হইবে। এই বিধানানুযায়ী দলপতি ও সামান্য অবস্থাপন্ন অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রথম বৎসর প্রায় ১২৫৯৲ টাকা পরিমিত আয়কর আদায় হইয়াছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে — আয় কর আদায় করিবেন এবং অন্যান্য রূপ ভীতিজনক জনরব পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় বলা বাহুল্য যে পুলিশই এইজন্য বিশেষ দায়ী—পাহাড়িয়ারা এক বিদ্রোহ সৃষ্টি করিল তাহারা জোয়ই নামক স্থানের থানাঘর জ্বালাইয়া দিল। সেখানে যে সিপাহীর দল ছিল তাহারাও পরাজিত হইল। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য শিখ সৈন্য ও হস্তী ইত্যাদি প্রেরিত হইল কিন্তু পার্ব্বত্য সিন্‌টিঙ্গসেরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কেবল মাত্র তীর ধনুক লইয়া অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নানারূপ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্য দিয়া অবশেষে এই বিদ্রোহ দমিত হইয়াছিল। কেবল মাত্র ঘর প্রতি যে কর সেটা রহিয়া গেল; গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য টেক্স ইত্যাদি রহিত করিয়া দিলেন। এইবার সিনইটাঙ্গস্‌দিগকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরক্ত প্রজা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নানাদিক্ দিয়া

তাহাদের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন। পথ ঘাট প্রস্তুত হইল, বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচণ-দ্বারা 'দোলোই' বা সর্দ্দার নিযুক্ত করিবার ভার দেওয়া গেল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত হইল। জোয়াইতে খাসিয়া ভাষাভিজ্ঞ একদল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন—তাঁহার উপর বৎসরে একবার করিয়া প্রত্যেক গ্রাম পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইল। এইভাবে জয়ন্তিয়া-বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

আফিম চাষ বন্ধ

পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীরা আফিংখোর ছিল। ভারতবর্ষের কোথাও তাহাদের ন্যায় আফিংখোর দেখিতে পাওয়া যাইতে না। কবে কোন্ যুগে আফিংয়ের চাষ প্রথমে আসাম অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হয় সে ইতিহাস উদ্ধার করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন যে রাজা লক্ষ্মীসিংহের রাজত্বকাল হইতেই আসামে আফিং চাষের প্রবর্ত্তন হয়। সেকালে আসামের অধিবাসীরা আফিংখোর হইয়া অলস ও কর্ম্মে অপারগ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রবিন্সন্ সাহেব আসামের অধিবাসীদের আফিংয়ের নেশা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে "three-fourths of the population are opiumeaters, and men, women and children alike use the drug." এদেশের তৃতীয় চতুর্থাংশ লোকই অফিংখোর। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বলিকা সকলেই সমান ভাবে আফিং খাইয়া থাকে। গভর্মেণ্ট এই সব অকল্যাণের দিক্ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আফিং চাষ বন্ধ করিয়া দিলেন অথচ যাহাতে প্রজাগণ একেবারেই আফিং পাইতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য ট্রেজারি হইতে প্রয়োজনানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট রূপে আফিং কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া

দিলেন। এইরূপে ব্যবস্থায় আফিংয়ের অনিষ্টদায়ক নেশার পরিমাণ আসাম অঞ্চলে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতি-১৮৫৩

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শাসন-প্রণালী সুপ্রণালী-বদ্ধ করিবার জন্য এবং ছয়টি জেলার শাসনভার সুপরিচালিত করিবার জন্য গৌহাটিতে একজন কমিশনার ও তাঁহার একজন সহকারী ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের দুই জনের গৌহাটিতে থাকিয়া কাজ করিবার ব্যবস্থা হইল। বরপেটা, তেজপুর, উত্তর লক্ষীমপুর এবং গোলাঘাট এই চারিটি মহকুমার জন্য চারিজন সহকারী নিযুক্ত হইলেন। কমিশনারের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল মাসিক ২,০০০৲ টাকা, এসিষ্টাণ্ট কমিশনারদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল মাসিক ১,০০০৲ টাকা এবং সহকারী কর্ম্মচারীদের বেতন যথাক্রমে ৫০০৲ ও নিম্নতম কর্ম্মচারীর বেতন ঠিক্ হইয়াছিল ৩০০৲ টাকা।

আদালতের ভাষা

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আসাম প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রথম অবস্থায় আদালতে আসামিয়া ভাষার প্রবর্ত্তন করেন কিন্তু পরে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হয়। যখন সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বাঙ্গালার লেপ্‌টে-নাণ্ট গভর্ণার ছিলেন তখন আসামবাসীরা বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে পুনরায় আসামিয়া ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহার ফলে পুনরায় আসামীয়া ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে। আসামিয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই এইরূপ মন্তব্যই আসামবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পোষণ করিতেছেন। ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই বলিয়া আমরা এবিষয়ে নিরস্ত রহিলাম।

নিয়ন্ত্রিত (Regulation) ও অনিয়ন্ত্রিত জেলা (Non-Regulation)

ভারতবর্ষে বহু দিন হইতেই কতকগুলি প্রদেশ-নিয়ন্ত্রিত (Regulation) ও কতকগুলি প্রদেশ অনিয়ন্ত্রিত (Non-Regulation) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলি সনন্দ আইনের বলে সপার্ষদ গভর্ণার জেনারেল কর্ত্তৃক যেসকল নিয়ম গঠিত হইত, তদ্বারা শাসিত হইত। অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ গুলি সপার্ষদ গভর্ণার জেনারেলের শাসন-মূলক আদেশের দ্বারা শাসিত হইত। এই অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশের শাসন-যন্ত্রের আকার এবং গঠন-প্রণালী ভিন্ন ছিল। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে জেলা বিভাগই অতি প্রয়োজনীয় বিভাগ। নিয়ন্ত্রিত প্রদেশে (Regulation Provinces) এক একটী জেলার উপর এক একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রদেশে (Non-Regulation Provinces) এক একটী জেলার উপরে এক একজন ডেপুটি কমিশনার আছেন। আসামের শ্রীহট্ট নিয়ন্ত্রিত (Regulation District) জেলা।

আসাম শাসনের জন্য চীফ্ কমিশনার নিয়োগ

পূর্ব্বে আসাম, বাঙ্গালাদেশের লেপ্‌টেনাণ্ট গভর্ণারের শাসনাধীনে ছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের ন্যায় বৃহৎ প্রদেশের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিয়া লেপ্‌টেনাণ্ট গভর্ণারের পক্ষে আসাম প্রদেশ পরিদর্শন উপলক্ষে আসাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর বাঙ্গালা দেশের সহিত আসামের অবস্থা সব দিক্ দিয়াই ভিন্ন রকমের। নানাদিক্ দিয়াই ভিন্নরূপ ব্যবস্থা থাকায় আসামের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে অসুবিধা হইতেছিল। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল্ যখন বাঙ্গালাদেশের লেপ্‌টেনাণ্ট গভর্ণার তখন তিনি ভারত-গভর্মেণ্টের সহিত লেখা-পড়া করিয়া বাঙ্গালাদেশ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে আসামপ্রদেশ গঠন

করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অনুমোদনে আসাম বাঙ্গালা হইতে পৃথক হইল এবং তথাকার শাসনভার একজন চীফ্‌কমিশনারের উপর অর্পিত হইল। সে বৎসরই ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে শ্রীহট্ট জেলাও আসাম প্রদেশের অঙ্গীভূত হইল। লেপ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল আর, এইচ্‌ কিটিঙ্গস্‌—আসামের প্রথম চীফ্‌কমিশনার নিযুক্ত হন, সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে আসিবার পূর্ব্বে আসামের আভ্যন্তরীণ ভাগের বিধি-ব্যবস্থা অতি বিশৃঙ্খল রকমের ছিল। কর্ণেল পোলোক (Colonel Pollok) আসাম প্রদেশ চীফ্‌ কমিশনারের শাসনাধীনে আসিবার পূর্ব্বে আসাম গিয়াছিলেন, তিনি তদানীন্তন আসামের শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে—"Generally the officials in Assam knew very little of the country." আসামের রাজকর্ম্মচারীরা আসাম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এইরূপ বলা যাইতে পারে। চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে আসিবার পর হইতেই নানা দিক্‌ দিয়া আসামের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক সুদক্ষ সিভিলিয়ান্‌ ঐ অঞ্চলের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। স্থানীয় কর্ম্মচারীদের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া হইল। শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ও ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা হইল। অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইল। অনেক আইন-কানুন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল।

প্রথমেই শ্রীহট্টের ন্যায় বৃহৎ জেলার মধ্যে কয়েকটি মহকুমা গঠিত হইল। শ্রীহট্টের ন্যায় বৃহৎ জেলার অধিবাসীদের পক্ষে

শ্রীহট্ট জেলায় মহকুমার সৃষ্টি

দুর্গম পথঘাট অতিক্রম করিয়া সুবিচার পাইবার জন্য অতি দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতেও শ্রীহট্টে আসা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ছিল। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবিবাজার এবং করিমগঞ্জ এই চারিটি মহকুমা গঠিত হইয়া তথায় বিচার ও শাসনের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়ায় দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইল। জয়ন্তিয়া পরগণার শাসনকার্য্য সুপরিচালিত করিবার জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলা সমূহে জুডিসিয়েল কমিশনার বা জজের পদের সৃষ্টি হইল। তাহাদের ক্ষমতা বাঙ্গালা দেশের বিভাগীয় কমিশনারগণের ন্যায় ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জজ ও ডেপুটি কমিশনারের দুইটী পদ সৃষ্টি হওয়ায় বিচার ও শাসন বিভাগের সুব্যবস্থা হইল। এইরূপ ভাবে শাসনপ্রণালী ও বিচার-প্রণালী ইত্যাদি সুগঠিত ও সুব্যবস্থিত হইবার পরে ধীরে ধীরে আসাম গভর্মেণ্ট সৈন্য-সংগঠন, মিলিটারি পুলিশ গঠন—এবং সদিয়া, বালিপাড়া, কাছাড়, শ্রীহট্ট, পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহের জরিপ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও শাসন শৃঙ্খলাবদ্ধ বিস্তৃত সুন্দর প্রদেশ সংগঠন করিয়াছেন।

বৈষয়িক বিবিধ উন্নতি, পথঘাট গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আসাম প্রদেশে গরুর গাড়ী কিংবা ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদির প্রচলন ছিল না। যে দুই চারিটি রাস্তা ছিল তাহাও চলাচলের অযোগ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীর দিয়া যে দুইটী রাস্তা সমান্তরাল ভাবে চলিয়া যাইতে দেখা যায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ রাস্তা দুইটীর নির্ম্মাণ কার্য্য ও আরম্ভ হয় নাই। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার কোন পথই ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে পথঘাট সম্বন্ধে আসাম প্রদেশে প্রভূত উন্নতি—সংসাধিত হইয়াছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট

স্থাপিত হয় এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লোকেলবোর্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। লোকেল বোর্ড গভর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত ভাবে যে টাকা পান তাহা হইতেই স্থানীয় পথঘাটের প্রয়োজনানুরূপ উন্নতি করিয়া থাকেন। এক্ষণে আসাম-অঞ্চলে গাড়ী ঘোড়া চলিবার উপযোগী পথ প্রায় ৫,৯১৫ মাইল পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, ২,২৮৩ মাইল উপযোগী পথ ও বেশ চলাচলের উপযোগীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে।

রেল ও ষ্টীমার

পূর্ব্বে নৌকা ভিন্ন আসামে যাতায়াত করিবার কোনও সুবিধা ছিল না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ব্রহ্মপুত্রের বুক দিয়া ষ্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা হয়। এখন ষ্টীমার-পথে গোয়ালন্দ হইতে ডিব্রুগড় এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যেই যাওয়া যায়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম আসাম-অঞ্চলে রেলপথ প্রস্তুত হয়। একটী জোরহাট জেলার এবং অপরটি থেরিয়াঘাট হইতে কোম্পানীগঞ্জ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। শেষোক্ত লাইনটি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জোরহাটের লাইনটি এখনও বেশ চলিতেছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আসাম বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। এই রেলওয়ে লাইন চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, উত্তর কাছাড়ের পর্ব্বত শ্রেণী অতিক্রম করিয়া লামডিং হইয়া ডিব্রু-সদিয়া রেলওয়ে লাইনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। লামডিং হইতে গৌহাটি পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইন গিয়াছে। আসামে এই লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০৭ মাইল। আবার দুইটি শাখা লাইন ও আছে একটী চাপ্‌রামুখ হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী শিলঘাট নামক স্থান, দূরত্ব ৫১ মাইল, অপরটি লালবাজার হইতে কাটাখাল পর্য্যন্ত দূরত্ব একুশ মাইল মাত্র।

এতদ্ব্যতীত ইষ্টার্ণবেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়েও গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় বিস্তৃত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ১৮০ মাইল। এই লাইনের দ্বারা কলিকাতা হইতে আসামের সংযোগ সাধিত হওয়ায় যাতায়াতের সুব্যবস্থা হইয়াছে। বালিয়াপাড়া, ওরাঙ্গ এতদ্ব্যতীত তেজপুর ও সিঙ্গ্রী প্রভৃতি স্থানেওরেলপথের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইংরাজ-শাসনাধীনে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রেল,ষ্টীমার,টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রবর্ত্তনে যাতায়াতের ও সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা হইয়াছে এবং অল্প মাশুলে চিঠিপত্র পাঠাইবার সুবিধা হওয়ায় নানাদিক্ দিয়াই দেশের কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

আসামে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এখানে কয়েকটি প্রধান ভূকম্পনের বিষয় উল্লেখ করা গেল। মীরজুম্লার আসাম-অভিযান কালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গরগাঁওয়ে অর্দ্ধঘণ্টাকালস্থায়ী এক ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। আর একটী হইয়াছিল রুদ্রসিংহের রাজত্বকালে—ঐ ভুমিকম্পের ফলে অনেক ঘর-বাড়ী এবং মন্দির ইত্যাদি ধ্বংস হইয়াছিল। তারপর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় অঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়া প্রচুর ক্ষতি করিয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের একটী ভূমিকম্পে শিলং, গৌহাটি প্রভৃতি অঞ্চলের বহু ঘর-বাড়ী ধ্বংস হইয়া প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে আসামে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে তাহার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ভূমিকম্পগুলি কিছুই নয় বলিতে হইবে। শিলং এর অনতিদূরেই এই ভীষণ ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়: সে কি ভীষণ প্রলয় নাদ! তাহা যাহারা প্রত্যক্ষভাবে শুনিয়াছেন তাহারা ছাড়া কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্প

ভূ-পৃষ্ঠ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল—বড় বড় গাছপালাগুলি দোলাতুলি করিয়া একেবারে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। বড় বড় পাথরগুলি উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কয়েক মূহুর্ত্তেরমধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। গৌহাটি এবং শ্রীহট্টের ক্ষতি হইয়াছিল খুবই বেশি। এই ভূকম্পনে প্রাকৃতিক একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সমতলভূমি জলাশয়ে পরিণত হইয়াছিল এবং নদী শুকাইয়া গিয়াছিল, শস্য-শামলা উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্র কৃষির অযোগ্য বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পাহাড় ধসিয়া এবং নদীর তীর ভাঙ্গিয়া পড়ায়ই এইরূপ প্রাণহানি হইয়াছিল। যদি রাত্রিকালে এই ভূকম্পন হইত তাহা হইলে আরও যে কত হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি হইত তাহা কল্পনাও করা যায় না। এই ভূমিকম্পের ফলে বরপেটা বর্ষার সময় বাসের অযোগ্য স্থানে পরিণত হইয়াছে, এই নিমিত্ত বরপেটা হইতে মনাস নদীর তীরবর্ত্তী বর-নগর স্থানে মহকুমা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পার্ব্বত্য-সীমান্ত জাতির পরিচয়

আসামের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রনদ প্রবাহিত হইয়া এক সুন্দর উপত্যকা ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপত্যকার দক্ষিণ সীমায়

যে সকল পর্ব্বতমালা দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে অনেক পার্ব্বত্য-জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ উত্তরে ও দক্ষিণে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যেও বনে-জঙ্গলে বহু পার্ব্বত্যজাতির বাসভূমি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে এই সকল পার্ব্বত্য-জাতির সংস্রবে আসিতে হইয়াছে।

ভুটিয়া (১৮৬৪-১৮৬৬)

প্রথমে ভুটিয়াদের কথা বলিতেছি। প্রথমতঃ বাঙ্গালার সীমান্ত-প্রদেশের অন্তঃর্গত ভুটিয়াদের সহিত কলহের সূত্রপাত হয়, সেই কলহ যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পরিশেষে যুদ্ধে দাঁড়াইল, তখন আসামের দিকেও তাহা ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালাদেশের জলপাইগুড়ি হইতে আসাম-গোয়ালপাড়া, গৌহাটি প্রভৃতি হইতে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। একদল সৈন্য বিশেনগিরিও অপর দল দেওয়ানগিরি দখল করিয়াছিল। প্রথমে শত্রু পক্ষ হইতে তেমন কোন বাধাবিঘ্ন আসে নাই। দেওয়ানগিরির দিকে ভুটিয়া-দিগকে সমতল ভূমির সর্ব্বপ্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়া জব্দ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছিল। কর্ণেল ক্যাম্পবেল্ অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া দেওয়ানগিরিতে অবস্থানটা নিরাপদ মনে করিলেন না, তিনি রাত্রিতে দেওয়ানগিরি পরিত্যাগ করিলেন—কিন্তু রাত্রির গভীর অন্ধকারে পথ হারাইয়া এবং শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই মাস পরে নূতন সৈন্যদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া ভুটিয়াগণ দেওয়ান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইংরাজ পক্ষে অতি অল্প সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ভুটিয়ারা অতি নৃশংসভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর ভুটিয়াদের সহিত আর কোনরূপ কলহ হয় নাই।

আকাজাতি

আসামের উত্তর সীমায় আকা নামক পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতের অধিবাসীরাই আকাজাতি নামে পরিচিত। আকাজাতি দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—এক সম্প্রদায়ের নাম হাজারী ক্ষোয়া (Hazari Khoua) অপর সম্প্রদায়ের নাম কাপাস চোর (Cotton Thieves)। অনেক দিন হইতে হিংস্রস্বভাবাপন্ন এই আকাজাতি সমতল ভূমিতে আসিয়া বিবিধ উপদ্রব করিত, আহোম রাজত্বকাল হইতেই ইহারা এইরূপ অত্যাচার করিয়া আবার নিরাপদ পার্ব্বত্য-প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত কাপাস চোর সম্প্রদায়ের নেতা বা সর্দ্দার টঙ্গি বা টগী রাজা সমতল ভূমিতে আসিয়া লুঠপাট এবং খুনজখম করিয়া পলায়ন করিত। তাহার উৎপাতে সমতলবাসীরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে টগী রাজা ধৃত হইয়া গৌহাটির জেলখানায় আবদ্ধ হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জেল হইতে ছাড়া পাইবার অব্যবহিত পরেই সে পুনরায় উৎপাত আরম্ভ করে। ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত প্রজাদের পল্লী-ভবন জ্বালাইয়া দিয়া বালিয়াপাড়া থানা ধ্বংস করিয়া সে ভয়ানক অনর্থের সৃষ্টি করিতে থাকে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে টগী রাজা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা স্থাপন করতঃ সামান্য ভাত্তা লইয়া সমতল ভূমিতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিল। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজ্যের সীমানা লইয়া গোল হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেধি এবং চণ্ডী নামক কাপাস চোর সম্প্রদায়ের নেতৃদ্বয় ইংরাজ-রাজের কর্ম্মচারীদের ধরিয়া লইয়া যায়—পরে ইংরাজরাজ তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে উদ্ধার করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত আকাদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে,

তাহারা এখন শান্তিতে বাস করিতেছে, আর কোনরূপ অশান্তি ও উপদ্রব করে না।

দাফ্‌লাজাতি

দাফ্‌লা পাহাড়—দাফ্‌লাজাতির বাস। আকা পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে এই পাহাড় অবস্থিত। ইহাদের ভাষার সহিত আবরও মিরিদের ভাষার অনেকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বাসভূমির পূর্ব্বদিকে রাঙ্গা নদী এবং পশ্চিম সীমায় ওরেল-নদী প্রবাহিতা। ইহারা দেখিতে খর্ব্বাকৃতি হইলেও খুব শক্তিশালী এবং সাহসী। ইহাদের দেহও অত্যন্ত সুগঠিত। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা প্রায়শঃই সমতল ভূমিতে আসিয়া অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত। আহোম রাজাদের রাজত্বকালে তাহারা সমতল ভূমিতে আসিয়া লুণ্ঠনের ভয় দেখাইয়া কর সংগ্রহ করিত তাহাদের এই যে লুণ্ঠন প্রবৃত্তি তাহা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম লিখিয়াছেন যে— 'দাফ্‌লারা আসাম রাজের শাসন একেবারেই মানে না, সুবিধাও সুযোগ মত সমতল ভূমিতে আসিয়া লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ইহাদের একটা আপোষ হয়। সেই আপোষের পর তাহারা দুইবার মাত্র শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। ১৮৭০-৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে দাফলারা দরং জেলার একটী পল্লীতে উপস্থিত হয় এবং দুইজন লোককে বধ করে এবং ৪৪ জন লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহাদিগের অত্যাচার

* "In the days of Aurangzeb, Muhaammad Kasim wrote ;" The Daflas are entirely independent of the Assam Raja and plunder the country contiguous to their mountains whenever they find an opportunity. Gaits' Assam Page—321.

দমন করিবার জন্য দাফ্‌লাগণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, দাফ্‌লারা কোনরূপ বাধা দেয় নাই, ইংরাজ-সৈন্য অতি সহজেই বন্দীদের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল তাহাদের মুক্ত করিয়া আনিতে পারিয়াছিল। এখন দাফলারা বেশ শান্তভাবে বাস করিতেছে। দাফ্‌লাজাতির একটী শাখার নাম আঙ্কা বা আপাতানঙ্গ (Apa Tanangs) উত্তর লক্ষ্মীমপুর মহকুমার উত্তর সীমানায় পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চাৎভাগে কালি নদীর উপত্যকাভূমিতে আঙ্কারা বাস করিয়া থাকে। অনেকদিন পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্যজাতির অস্তিত্বের কথা কেহ বড় একটা জানিতেন না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আঙ্কারা ব্রিটিশ রাজ্যে আসিয়া দুইটী লোককে মারিয়া ফেলে এবং তিনটি লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। একদল সৈন্য ইহাদের অনুসরণ করিয়া বিনা বাধায় বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই।

আঙ্কা বা আপা তানাঙ্গ

মিরিজাতি

মিরিজাতি আসাম উপত্যকার সমতল ভূমিতে এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশে বাস করে। সমতল ভূমির অধিবাসী মিরিরা ইংরাজের প্রজা এবং বেশ শান্তি-প্রিয় জাতি। লক্ষীমপুর জেলার উত্তর সীমায় মিরি পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতে ইহারা বাস করে। ইহাদের দেহ দীর্ঘ, গঠন সুন্দর এবং সদা প্রফুল্ল এবং হাস্যময়। মিরিরা সমতলবাসীদের উপর কোনদিন কোন অত্যাচার করে নাই।

আবর জাতি

আসামের উত্তর সীমায়—দিবাং এবং সিওম নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, আবরেরা সেখানে বাস করে। আবর জাতির ভাষা ও মিরি জাতির ভাষা এক হইলে ও আচার ব্যবহারও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। উত্তর-সীমান্ত-পার্ব্বত্য

প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এমন দুর্দ্ধর্শ, অসভ্য ও উগ্র স্বভাবের জাতি একটীও নাই। এজন্যই ডিব্রুগড় ও সদিয়ার মধ্যস্থিত ভূভাগের ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে লোকের বসতি খুব কম—প্রধানতঃ ইহাদের ভয়েই কেহ ঐ অঞ্চলে বাস করিতে চাহে না। আবর শব্দের অর্থ স্বাধীন। যে জাতি বরি অর্থাৎ অধীনতা মানেনা। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহাদের সহিত ইংরাজ-রাজের গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমাংশবাসি পানীমেয়ং এবং পূর্ব্ব ভূভাগবাসি বঁড় আবরগণ সম্মিলিত হইয়া ইংরাজ প্রজাগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে। এই অত্যাচার দমন করিবার জন্য একটী অভিযান প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হয়, আবরগণ ইংরাজ-সৈন্য অভিযানের আয়োজন করিতেছে দেখিতে পাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করে। তখন এইরূপ ভাবে সন্ধি হয় যে যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা শান্তভাবে ইংরাজের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া অবস্থান করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরাজগভর্মেণ্ট তাহাদিগকে লবণ, আফিং, তামাক প্রভৃতি সরবরাহ করিবেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা শান্তি ভঙ্গ করিয়া ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ হইতে ৪ জন মিকির প্রজাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইয়া হত্যা করে। ইংরাজ সৈন্য ইহার উপযুক্ত দণ্ড আদায় করিয়া লন্। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বশ্রেণীর আবরেরাই মিলিত ভাবে ভীষণ উৎপাত করিতে থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য এক অভিযান প্রেরিত হইল। আবরদিগের বাসস্থান অবরুদ্ধ করা হইল। অবশেষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আবরেরা অধীনতা স্বীকার করে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আবার, আবর জাতির সহিত অশান্তির কারণ

ঘটে। এ সময়ে সদিয়ার এসিষ্টাণ্ট পলিটিক্যাল অফিসার মিঃ উইলিয়মসন্ (Mr. Williamson) ডাঃ গ্রেগারসন্ (Gregarsan) এবং অনেক লোকজন কুলি ও চাকর প্রভৃতি সহ আবরগণের বিশ্বাসঘাতকতায় পড়িয়া পাশিঘাটের উত্তরে গাঙ্গিনামক স্থানে নিহত হন। এই অন্যায়ের প্রতিবিধান শীঘ্রই সম্পন্ন হইল। ইংরাজ সৈন্য ভীমদর্পে আবর-অভিযানে অগ্রসর হইলেন। আবরেরা পরাজিত হইয়া শান্ত হইল। তাহাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবার জন্য সদিয়া এবং বালিয়াপাড়া সীমান্ত প্রদেশ নামে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইয়া উহার শাসনভার সম্পূর্ণরূপে পলিটিকেল অফিসারের উপর অর্পিত হইল। তদবধি আবরেরা শান্তিতে বাস করিতেছে এপর্য্যন্ত আর কোন গোলযোগ উপস্থিত করে নাই।

মিশ্ মিজাতি

মিশ্ মিজাতি দিবং এবং ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অর্থাৎ আসামের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে বাস করে। মিশ্ মিরা চুলিকাটা, দিগারু, মিজু এবং বিবিজিয়া এই চারিশাখায় বিভক্ত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী ধর্ম্মযাজক মিজু দেশের ভিতর দিয়া তিব্বতের দুরধিগম্য প্রদেশে যাইয়া পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার গমনকালে তিনি নিহত হন। এই অত্যাচারী মিশ্ মি সর্দ্দারকে তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। লেফ্ টেনাণ্ট ইডেন্ মাত্র কুড়িজন সিপাহী এবং চল্লিশজন খাম্তি সৈন্য লইয়া অপরাধী মিশ্ মি সর্দ্দারের গ্রামে যাইয়া তাহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। মিশ্ মিজাতি বাণিজ্যপ্রিয়। তাহারা পশুপালন করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। মিশ্ মিদের দেশে গরু, ঘোড়া, খচ্চর, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

খামতিজাতি

খাম্‌তিজাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্ব্ব প্রান্তে বাস করে। ইহাদেয় একদল লোক সদিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে থাকে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সদিয়ার খাম্‌তি সর্দ্দারকে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহার পরে তাহার পুত্র ইংরাজ-রাজার বশ্যতা স্বীকার না করায় তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। এই জন্য খাম্‌তিরা বিদ্রোহী হইয়া সদিয়ায় কর্ণেল হুয়াইট্‌ সাহেবকে হত্যা করে। সদিয়া অঞ্চলে খাম্‌তিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। বিগত আদমসুমারীতে ইহাদের সংখ্যা মাত্র ১,৯৭৫ এ পরিণত হইয়াছে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে খাম্‌তিদের সংখ্যা ছিল ৩,৯৩০ জন।

সিংফোজাতি

জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বে সিংফোজাতির বাস। অতি প্রাচীনকালে তাহারা ইরাবতী নদীর উৎপত্তি স্থানে বাস করিত বলিয়া কথিত আছে। সদিয়ার পূর্ব্বদিকে বুড়ীদিহিং, নোয়া দিহিং ও তেঙ্গাপানি নদীর তীরে আহোম রাজাদের রাজত্বকালে তাহারা আসিয়া বাস করিতে থাকে। সিংফো শব্দের অর্থ মানুষ। ইহারাও স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইত। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা-ভূমিতে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় সিংফোজাতি বাধা প্রদান করে কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়, পরাজয়ের পরে তাহারা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। সিংফোরা পাহাড়ের গায় ও সমতল ভূমিতে পল্লীগঠন করিয়া বাস করে। এক একজন সর্দ্দার কয়েকটী পল্লীর উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন।

মিকিরিজাতি

মিকিরিজাতি ভীরু ও শান্তিপ্রিয়। ইহারা নওগাঁও শিবসাগর জেলার পাহাড়ে বাস করে। তাহারা ছোট ছোট পল্লীতে বাস করে। ধান, তূলা ইত্যাদি ইহারা প্রচুর পরিমাণে

উৎপন্ন করে। মিকিরিদের প্রধান খাদ্য ধান্য। ইহারা অত্যন্ত মদ্য প্রিয়।

নাগাজাতি

নাগারা—নাগাপাহাড় জেলায়ই বেশি পরিমাণ বাস করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জেলার পাহাড় পর্ব্বতেও তাহারা বাস করে। নাগারা নানা জাতিতে বিভক্ত। আঙ্গামী, আও ও লোটা এই তিনটি শ্রেণী প্রধান। পূর্ব্বে নাগারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিত এখন তাহারা কোমরে সামান্য কাপড় জড়াইয়া রাখে। আহোম রাজারা এই স্বাধীন দুর্দ্দমনীয় জাতিকে শাসনাধীনে আনিতে পারেন নাই। ইংরাজরাজ নাগাদিগকে পরাজিত ও শাসনে আনিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজ সেনা দশবার নাগাদিগকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লোটা নাগারা উপদ্রব আরম্ভ করায় ইংরাজরাজ তাহাদের রাজ্য অধিকার করেন। এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে নাগাগণ নাগা পাহাড়ের পলিটিকেল অফিসার দমণ্ট সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং আদামী নাগাগণ ওদিকে কোহিমা আক্রমণ করে। মণিপুরের রাজা এই সময়ে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল জনষ্টনকে দুই হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। নাগারা পরাজিত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিয়া নিয়মিত ভাবে ইংরাজ রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব দিয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট প্রত্যেক গ্রামে এক একজন সর্দ্দার নিযুক্ত করিলেন। সর্দ্দারেরা শাসন বিষয়ে বা রাজস্ব আদায়ে অসমর্থ হইলে ইংরাজ গভর্মেণ্টের নিকট অভিযোগ করিলে সুবিচার করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ সীমায় যে পর্ব্বতমালা দাঁড়াইয়া

আছে, তাহারই পশ্চিমাংশে গারো পাহাড় জেলা অবস্থিত। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে গোয়ালপাড়া, দক্ষিণে ময়মনসিংহ জেলা ও পূর্ব্বে খাসিয়া পাহাড় অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৩৯৪০ বর্গ মাইল। এখানেই অধিকাংশ গারো বাস করে। গারোদের দৈহিক গঠন অতি সুন্দর। তাহারা সুগঠিত বলবান্ ও কর্ম্মঠ। তাহাদের নাসিকা খর্ব্বাকৃতি, চক্ষু ক্ষুদ্র ও তারকার রং সাধারণতঃ নীল। তাহাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণ না হইলেও খাসিয়াদের অপেক্ষা কিছু ময়লা। গারো পুরুষেরা দেখিতে অনেকটা সুশ্রী হইলেও গারো রমণীরা দেখিতে ভয়ানক কুৎসিত। তাহারা স্থূল ও খর্ব্বাকৃতি।

গারোজাতি

গারোরা প্রায় সকল রকম জন্তুই খাইয়া থাকে—এমন কি কুকুর, ব্যাঙ, সাপ প্রভৃতি কোনটাই তাহাদের অখাদ্য নয়। তাহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া থাকে। শিশুরা গিলিতে শিখিবামাত্রই তাহাদের মদ্যপান করান হয়।

গারোরা তিনটি গোত্র বা বিভাগে বিভক্ত। মমীন (Momin) মারাক (Marak) ও সঙ্গম (Sangam)। গারোদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ব্যতীত বিবাহ হয় না। গারো পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই গহনার ব্যবহার করিয়া থাকে। গারো স্ত্রীলোকেরা কাণে প্রায় ৫০।৬০টি রিং ব্যবহার করে। রিংগুলির ভারে যখন কাণ কাটিয়া যাইয়া রিংগুলি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন তাহারা সরু দড়ি দিয়া সেগুলিকে মাথার সাথে বাঁধিয়া দেয়।

ইংরাজ-শাসনের আরম্ভে কয়েক বৎসর গারো পাহাড় গোয়ালপাড়া জেলার অংশ ভাবে শাসিত হয়। তখনও গারো-জাতিকে সমতলবাসী লোকেরা ভয় করিত। গারোরা মাঝে

মাঝে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া নরহত্যা করিত। তাহাদের এই অত্যাচার দমন করিবার জন্য একজন বিশেষ সিভিল কমিশনার এই জেলার শাসনভার গ্রহণ করিয়া কর ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ গারোপাহাড় পৃথক্ জেলারূপে গঠিত হয়। এবং তুরাতে সদর ষ্টেসন স্থাপিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গারো জেলা সম্পূর্ণ ভাবে ইংরাজ শাসনাধীনে আসিল। গারো সর্দ্দারগণ ইংরাজ গভর্মেণ্টের শাসনকার্য্য সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। গারোরা এখন অনেকেই খ্রীষ্টান হইতেছে। গারো সর্দ্দারেরা "জুলিয়া" নামে পরিচিত। জুলিয়ারা তাহাদের সমুদয় বিবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে।

লুসাইজাতি

লুসাই পাহাড়ে লুসাই জাতির বাস। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় না। গারোদের ন্যায় লুসাইরাও সবজাতীয় পশু-পক্ষীর মাংসই খায়। এক সময়ে নরহত্যা তাহাদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। লুসাইজাতি খুব অতিথিবৎসল। গ্রামে অতিথির জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ থাকে সেখানে তাহারা পরম যত্নের সহিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া সযত্নে রাখে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মাথায় লম্বাচুল রাখে। পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীজাতি অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তামাক ইহাদের খুব প্রিয়। স্ত্রী-পুরুষের পোষাক প্রায় একরূপ। বর্ত্তমান সময়ে লুসাইরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতেছে।

লুসাই সর্দ্দার লাড়ু ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র শ্রীহট্ট হইতে কুড়িজন লোককে বধ করিয়া তাহাদের মাথা এবং ছয় জন লোককে ধরিয়া লইয়া যায়। ইংরাজ রাজ এই অত্যাচার দমনের জন্য রণাভিযান প্রেরণ করেন।

সর্দ্দার-পুত্র ধৃত এবং বিচারের ফলে দ্বীপান্তরিত হইল। ইহার পরেও সমতল ভূমিতে আসিয়া লুসাইরা উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইয়া দুই শত লোককে নিহত করিয়া তাহাদের মাথা সংগ্রহ করিয়া এবং একশত যুবতী স্ত্রীলোককে ধরিয়া লইয়া যায়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লুসাইরা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে এবং লুসাই পাহাড় একটী ইংরাজাধিকৃত জেলায় পরিণত হয়। লুসাই পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ প্রথমতঃ বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের অধীন হয় এবং উত্তরাংশ আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই অংশ দ্বারা লুসাই জেলা সংগঠিত হয় এবং এই জেলায় সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" নামে অভিহিত হন। লুসাই জেলার প্রধান সহর বা সদর ষ্টেশনের নাম আইজল।

খাসিয়া-জাতি

বর্ত্তমান সময়ে আসামের খাসিয়া জাতি শিক্ষা ও সভ্যতার দিক্ দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।—খাসিয়া পাহাড়ে পঁচিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। আহোম রাজাদের রাজত্ব কালে খাসিয়া তাঁহাদের অধীনতা মানিয়া লইয়াছিল। খাসিয়াদের সিয়েম-বংশীয়দের মধ্য হইতে প্রজাগণের মতানুযায়ী সিয়েমগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ডেভিড স্কট্ সাহেব যখন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে খাসিয়া পাহাড়ে রাস্তা নির্ম্মাণ করেন সে সময়ে খাসিয়ারা বিদ্রোহী হইয়া অনেক কুলি মজুরকে হত্যা করিয়াছিল। স্কট সাহেব চেরাপুঞ্জিতে যাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কাপ্তান লিষ্টারের নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্য তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইল। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ প্রায় চারিবৎসর কাল স্থায়ী ছিল। পরে সিয়েম তিরাত সিংহ বন্দী ভাবে ঢাকায় প্রেরিত

হইয়াছিলেন। সিয়েমরা ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিল। লিষ্টার সাহেব চেরাপুঞ্জিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া সেখান হইতে ইহাদের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্ন্মেণ্ট শিলং সহরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন।

এখন সিয়েমেরা মন্ত্রিগণের উপদেশঅনুযায়ী রাজ্য-শাসন করেন। ইংরাজরাজ তাঁহাদের নিকট হইতে কোন কর গ্রহণ করেন না। হত্যা ইত্যাদির ন্যায় কোনও গুরুতর অপরাধ হইলে শিলংএর ডেপুটি কমিশনার তাহার বিচার করেন!

খাসিয়ারা অন্যান্য আদিমজাতি অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহারা পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই ইংরাজীতে বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সর্প-পূজা ইহাদের একটী প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান।

খাসিয়াজাতির নানা শাখা আছে। তাহাদের মধ্যে কালা ও সাদা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্‌টেং নামক খাসিয়া জাতির এক শাখা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বাস করে। উত্তর কাছাড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশেও অনেক খাসিয়া বাস করিয়া থাকে।

পরিশিষ্ট—ক

আসাম রাজাদের আনুমানিক রাজত্বের সময় নিরুপণ তালিকা।
কামরূপরাজগণের পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ
শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্বকাল

রাজাদের নাম	রাজধানীর নাম	আনুমানিক রাজত্বকাল
পৌরাণিক যুগ অসুর রাজবংশ		
নরকাসুর	প্রাগ্জ্যোতিষপুর	এ সময়ের কোন তারিখ যথার্থ ভাবে সন্নিবেশ করা অসম্ভব বোধে উল্লিখিত হইলনা
বাণ অসুর	শোণিতপুর	
ভগদত্ত	প্রাগ্জ্যোতিষপুর	
বজ্রদত্ত	”	
সুবাহু	”	
ভীষ্মক	”	
বালি	শোণিতপুর	
বাণ	”	
ভালুক	ভালুকপুর	
অমূর্ত্ত	প্রাগ্জ্যোতিষপুর	
শঙ্কলকোচ	”	
		খ্রীষ্টাব্দ
পুষ্য বর্ম্মণ	...	৪৩০
সমুদ্র বর্ম্মণ	...	৪৪৬
বল বর্ম্মণ	...	৪৬২
কল্যাণ বর্ম্মণ	...	৪৭৮
গণপতি বর্ম্মণ	...	৪৯৪
নারায়ণ বর্ম্মণ	...	৫১০

রাজাদের নাম	রাজধানীর নাম	আনুমানিক রাজত্বকাল
		খ্রীষ্টাব্দ
মহাভূত বর্ম্মণ		৫২৬ ,,
চন্দ্রমুখ বর্ম্মণ		৫৪২ ,,
স্থিত বর্ম্মণ		৫৫৮ ,,
সুশিষ্ট বর্ম্মণ (মৃগাঙ্ক)		৫৭৪ ,,
ভাস্কর বর্ম্মণ		৫৯০-৬০৬
শালস্তম্ভ		৬৬৪ ,,
বিগ্রহস্তম্ভ		৬৮০ ,,
পালকস্তম্ভ		৬৯৬ ,,
বিজয়স্তম্ভ		৭১২ ,,
প্রলম্ভ		৮০০ ,,
হার্জ্জর	হরুপেশ্বর	৮২০ ,,
বনমাল	,,	৮৩৬ ,,
জয়মাল	,,	৮৫২ ,,
বীরবাহু		৮৬৮ ,,
বলবর্ম্মন	,,	৮৮৪ ,,
ত্যাগসিংহ	,,	৯৯০ ,,
ব্রহ্মপাল	...	১০০০ ,,
রত্নপাল	শ্রীদুর্জ্জয়	১০১৬ ,,
(পুরন্দর পাল)	,,	
ইন্দ্রপাল	,,	১০৪৮ ,,
তিষ্যদেব	,,	১১২০
বৈদ্যদেব	হাম সকোঞ্চি	১১৩৩

আহোমরাজাদের বংশ-তালিকা	রাজত্বকাল-আরম্ভ
সুকাফা	১২২৮—১২৬৮
সুতেফা	১২৬৮—১২৮১
সুবিন্ফা	১২৮১—১২৯৩
সুখাম্ফা	১২৯৩—১৩৩২
সুতুফা	১৩৩২—১৩৬৪
সুদানফা	১৩৯৭—১৪০৭
সুজাম্ফা	১৪০৭—১৪২২
সুফাক্ফা	১৪২২—১৪৩৯
সুসেম্ফা	১৪৩৯—১৪৪৮
সুসেন্ফ	১৪৪৮—১৪৯৩
সুহুংমুং	১৪৯৭—১৫৩৯
সুক্লেনমাং	১৫৩৯—১৫৫২
সুখেংফা	১৫৫২—১৬০৩
সুসেংফা—প্রতাপসিংহ	১৬০৩—১৬৪১
সুরামফা—ভাগারাজা	১৬৪১—১৬৪৪
সুতিয়াম্ফা—নড়িয়া রাজা	১৬৪৪—১৬৪৮
সুতিয়ান্ফা—জয়ধ্বজসিংহ	১৬৪৮—১৬৬৩
সুপুঙ্গমঙ্গ—চক্রধ্বজসিংহ	১৬৬৩—১৬৬৯
সুন্যাতফা—উদয়ধ্বজসিংহ	১৬৬৯—১৬৭৩
সুক্লাম্ফা—রামধ্বজ	১৬৭৩—১৬৭৫
সুঙ্গ	১৬৭৫—১৬৭৫
গোবর	১৬৭৫—১৬৭৫
সুজিন্ফা	১৬৭৫—১৬৭৭
সুদাইফা	১৬৭৭—১৬৭৯
সুলিক্ফা—লরা রাজা	১৬৭৯—১৬৮৭
সুসাংফা—গদাধর সিংহ	১৬৮১—১৬৯৬

আহোমরাজাদের বংশ-তালিকা	রাজত্বকাল-আরম্ভ
সুখ্রুমফা—রুদ্রসিংহ	১৬৯৬ -১৭১৪
সুতামফা—শিবসিংহ	১৭১৪ -১৭৪৪
সুনেম্ফা—প্রমত্তসিংহ	১৭৪৪ -১৭৫১
সুরাম্ফা—রাজেশ্বরসিংহ	১৭৫১ -১৭৬৯
সুনিওফা—লক্ষ্মীসিংহ	১৭৬৯ -১৭৮০
সুহিতপাংফা—গৌরীনাথসিংহ	১৭৮০ -১৭৯৪
সক্লিঙ্গফা—কমলেশ্বরসিংহ	১৭৯৫ -১৮১০
সুদিন্‌ফা—চন্দ্রকান্তসিংহ	১৮১০ -১৮১৮
পুরন্দরসিংহ—	১৮১৮ -১৮১৯
যোগেশ্বরসিংহ	১৮১৯ .
ব্রহ্ম-শাসন	১৮১৯ -১২৪
ব্রিটিশ-বিজয়	১৮২৪ .
আপার আসামে পুরন্দর সিংহের শাসন কাল—	১৮৩২—১৮৩৮

পরিশিষ্ট—(খ)

কোচরাজাদের শাসনকাল

রাজাদের নাম	সিংহাসন আরোহণের তারিখ	মৃত্যুর তারিখ
বিশ্বসিংহ	১৫১৫	১৫৪০
নরনারায়ণ	১৫৪০	১৫৮১
কোচবিহারের পশ্চিম অংশের রাজার নাম		
নরনারায়ণ	১৫৪০	১৫৮৪
লক্ষ্মীনারায়ণ	১৫৮৪	১৬২২
বীরনারায়ণ	১৬২২	১৬৩৩
প্রাণনারায়ণ	১৬৩৩	১৬৬৬
পূর্ব্বদেশীয় রাজ্য—কোচ হাজো		
রঘুদেব	১৫৮১	১৬০৩
পরীক্ষিত	১৬০৩	১৬১৩
বলি—(ধর্ম্মনারায়ণ)	১৬১৫	১৬৩৭
মহেন্দ্রনারায়ণ	১৬৩৭	১৬৪৩
চন্দ্রনারায়ণ	১৬৪৩	১৬৮০
সূর্য্যনারায়ণ	১৬৬০	১৬৮২
ইন্দ্রনারায়ণ	১৬৮২	১৭২৫

কয়েকজন কাছাড়ি রাজার রাজত্বকাল

ক্ষুণকরা	১৫৩১	... ...
দিৎসাং	১৫৩১	১৫৩৬
যশোনারায়ণ দেব	১৫৬৩	... ...
শত্রু-দমন—প্রতাপ নারায়ণ	১৬০৬	১৬১০
নরনারায়ণ	... ...	... ...
ভীমদর্প বা ভীমবল	১৬৩৭	... ...
ইন্দ্রবল্লভ	... ...	... ...
বীরদর্প	১৬৪৪—১৬৭১—	১৬৮১
গৌরধ্বজ	১৬৮১—১৬৯৫	... ...
মকরধ্বজ	১৬৯৫	... ...
উদয়াদিত্য	... ...	... ...
তাম্রধ্বজ	১৭০৬—১৭০৮	... ...
শূরদর্প	১৭০৮ ...	... ...
হরিশচন্দ্র নারায়ণ	১৭২১ ...	... ...
কীর্ত্তিচন্দ্র নারায়ণ	১৭৩৬ ...	... ...
সন্ধিবারি	১৭৬৫ ...	... ...
হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ	১৭৭১ ..	... ...
কৃষ্ণচন্দ্র	১৭৯০—১৮১৩	... ...
গোবিন্দচন্দ্র	১৮.৩—১৮৩০	... ...

জয়ন্তিয়া রাজবংশের রাজত্বকাল

	তারিখ		সিংহাসনচ্যুত হইবার তারিখ
	সিংহাসনারোহণ কাল	মৃত্যু	
পর্ব্বতরায়	১৫০০	১৫১৬	
মাঝ গোসেইন্	১৫১৬	১৫৩২	
বড় পর্ব্বতরায়	১৫৩২	১৫৪৮	
বড় গোসেইন্	১৫৪৮	১৫৬৪	
বিজয়মাণিক	১৫৬৪	১৫৮০	
প্রতাপরায়	১৫৮০	১৫৯৬	
ধনমাণিক	১৫৯৬	১৬০৫	
যশমাণিক	১৬০৫	১৬২৫	
সুন্দররায়	১৬২৫	১৬৩৬	
ছোট পর্ব্বতরায়	১৬৩৬	১৬৪৭	
যশমন্তরায়	১৬৪৭	১৬৬০	
বাণসিংহ	১৬৬০	১৬৬৯	
প্রতাপসিংহ	১৬৬৯	১৬৬৯	
লক্ষ্মীনারায়ণ	১৬৬৯	১৬৯৭	
রামসিংহ (১)	১৬৯৭	১৭০৮	
হরনারায়ণ	১৭০৮	১৭২৯	
বড় গোসেইন্	১৭২৯	১৭৭০	
ছত্রসিংহ	১৭৭০	১৭৮১	
যাত্রানারায়ণ	১৭৮১	১৭৮৬	
বিজয়নারায়ণ	১৭৮৬	১৭৮৯	
রামসিংহ (২)	১৭৮৯	১৮৩২	
রাজেন্দ্রনারায়ণ	১৮৩২	১৮৩৫	

পরিশিষ্ট—(গ)

আসামের ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তাগণের শাসনকাল

চীফ্ কমিশনার

(Chief Commissioners of Assam.)

কর্ণেল আর, এইচ্, কিটিঙ্গ ভি, সি, সি, এস্, আই (Colonel R. H. Keating V. C. C. S. I.)	১৮৭৪—১৮৭৮
স্যার এস্, সি, ব্যালি কে, সি, এস্, আই (Sir S. C. Bayley K. C. S. I.)	১৮৭৮—১৮৮১
স্যার সি, এ, ইলিয়ট কে, সি, এস্, আই (Sir C. A. Elliott K. C. S. I.)	১৮৮১—১৮৮৫
স্যার ডব্লিউ, ই, ওয়ার্ড কে, সি, এস্, আই (Sir W. E. Ward K. C. S. I.)	১৮৮৫—১৮৮৭
স্যার ডি, ফিট্জ্প্যাট্রিক্ কে, সি, এস্, আই (Sir D. Fitzpatric K. C. S. I.)	১৮৮৭—১৮৮৯
মিঃ জে, ডব্লিউ কুইণ্টন্ সি, এস, আই (Mr. J. W. Quinton C. S. I.)	১৮৮৯—১৮৯১
স্যার ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড কে, সি, এস্, আই (Sir W. E. Ward K. C. S. I.)	১৮৯১—১৮৯৬
স্যার এইচ্, জে, এস্, কটন কে, সি, এস্, আই (Sir H. J. S. Cotton K. C. S. I.)	১৮৯৬—১৯০২
মিঃ জে, বি, ফুলার সি, এস্, আই, সি, আ, ই (Mr. J. B. Fuller C. S. I. C. I. E.)	১৯০২—১৯০৫

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরগণ

(Lieutenant-Governors of Eastern Bengal and Assam.)

স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার কে, সি, এস্‌, আই, সি, আই, ই ১৯০৫—১৯০৬

(Sir Bamfylde Fuller K. C. S. I. C. I. E.)

স্যার ল্যান্সলট্‌ হেয়ার কে, সি, এস্‌, আই, সি, আই, ই ১৯০৬—১৯১১

(Sir Lancelot Hare K. C. S. I. C. I. E.)

স্যার চার্লস ব্যালি কে, সি, এস্‌, আই ১৯১১—১৯১২

(Sir Charles Bayley K. C. S. I.)

আসামের চীফ কমিশনার

স্যার আর্চ্চডেল আর্ল কে, সি, এস্‌, আই, কে, সি, আই, ই ১৯১২—১৯১৮

(Sir Archdale Earle K. C. S. I. K. C. I. E.)

স্যার নিকোলাস্‌ বিট্‌সন্‌ বেল্‌ কে, সি, এস্‌, আই, কে, সি, আই, ই ১৯১৮—১৯২১

(Sir Nicholas Beatson Bell K. C. S. I. K. C. I. E.)

(দু'মাস কাল গভর্ণরের কার্য্যও করিয়াছিলেন)

আসামের গভর্ণরগণ

স্যার উইলিয়ম মারিস্‌ কে, সি, এস্‌, আই, কে, সি, আই, ই ১৯২১—১৯২৩

(Sir William Marris K. C. S. I. K. C. I. E.)

স্যার জন্‌ কার কে, সি, আই, ই ১৯২৩—১৯২৮

(Sir John Kerr K. C. I. E.)

স্যার লরি হামোণ্ড কে, সি, এস্‌, আই ১৯২৮...

(Sir Laurie Hammond K. C. S. I.)

এতদ্ব্যতীত অল্পকালের জন্য অস্থায়ী ভাবে—স্যার উইলিয়ম ওয়ার্ড

(Sir William Ward) ১৮৮৩, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কলেট্ (Brigadier General Collet C. B.) ১৮৯১, সার চার্লস লায়েল (Sir Charles Lyall K. C. S. I. C. I. E.) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, মিঃ ফুলার (M. Fuller) ১৯০০, সি ডবলিউ বোল্টন (C. W. Bolton C. S. I.) ১৯০৩, কর্ণেল পি. বি. গর্ডন (Colonel P. B. Gordon C. S. I.) ১৯১৪ এবং ডবলিউ জে রিড (W. J. Reid K. C. I. E. C. S. I.) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকর্ত্তার কাজ করেন।

পরিশিষ্ট (খ)

আসামের বৈষয়িক উন্নতি

ইংরাজের শাসনাধীনে আসিবার পর হইতে আসামের যথেষ্ট বৈষয়িক উন্নতি হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরিষা, গোলআলু, রেশম প্রভৃতির চাষ দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। ডেভিড্ স্কট্ সাহেব আসিয়া পাহাড়ে গোলআলু চাষের প্রবর্ত্তন করেন। বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ স্থানেই সিলেট্ চূণ,—আসামের চূণের ব্যবহার চলিতেছে। খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণাংশেই চূণের খনি বেশি। অনেক স্থানে বিশেষতঃ লক্ষ্মীমপুর জেলার মাকুম অঞ্চলে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে কয়লার আমদানি হইতেছে। লেডো, মার্গারাটা প্রভৃতি স্থান কয়লার জন্য বিখ্যাত।

ডিগ্‌বয়তে কেরোসিনতেলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা হইতেছে চায়ের বাগানগুলি। রবার্ট ব্রুস্ (Robert Bruce) নামক একজন ইংরাজ ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশের

চায়ের চাষ

বনে-জঙ্গলে আপনাআপনি চা জন্মিয়া থাকে ইহা দেখিতে পান। আসাম অঞ্চলে চা উৎপন্নের

প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে রবার্ট ব্রুসের নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কেহ কেহ লেফ্‌টেনাণ্ট চার্লটনকেও এই আবিষ্কারের গৌরবের অধিকারী করিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক না কেন রবার্ট ব্রুসের ভ্রাতা মিষ্টার সি, এ, ব্রুস্ (Mr. C. A. Bruce) গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক চা-জঙ্গলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent of the Government Tea Forests) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নানাপ্রকার অবস্থান্তর চেষ্টা ও যত্নদ্বারা বর্ত্তমান সময়ে আসামপ্রদেশ চায়ের ব্যবসায়ের জন্য এবং চা-কর সম্প্রদায়ের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫২৭,০০০ শ্রমজীবী আসামের চা-বাগানে কাজ করিয়াছে। দিনদিনই আসামের চা-বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষীয়েরাও এক্ষণে সমবায় রীতিতে চায়ের চাষ করিতে মনোযোগী হইতেছেন। অনেক দেশী কোম্পানীর কাজও বেশ চলিতেছে।

চায়ের পরই এখানকার কাঠের ব্যবসা উল্লেখযোগ্য। এণ্ডি মুগার ব্যবসাও এখানে বেশ চলে। আসামের মহিলারা এণ্ডি ও মুগার অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। শাল কাঠ এবং বাঁশ বেত ইত্যাদি বনজঙ্গল হইতে কাটিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রেরিত হয়। সরকারি মন্তব্যানুযায়ী চা এবং কাঠ ইহাই হইতেছে এখানকার প্রধান ব্যবসা। (The chief exports are tea and timber) শিলচর, কাছাড় ও শ্রীহট্টই হইতেছে চায়ের চাষের জন্য বিখ্যাত।

আসামের ভৌগোলিক বিবরণ

আসাম প্রদেশের পরিমাণ, ৫৩,০০০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরসীমা তিব্বত এবং ভূটান। পশ্চিমে বাঙ্গালাদেশ। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ। লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষের কিছু উপরে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাপ্রদেশের অধিবাসীরা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী পাহাড়িয়া জাতিরা নানারূপ

ভূত, প্রেত ইত্যাদির উপাসক। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকের অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীও আছেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আসামে প্রবল বন্যা হইয়া দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি অকাল বন্যার জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। খাল, বিল, পুষ্করিণী, নদী মিলিয়া এক এক প্রকাণ্ড সাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ জলে ভাসিয়া চতুর্দ্দিক ভীষণ অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছিল। এরূপ বন্যা আসামে কোনদিন হয় নাই। গভর্মেণ্ট ও জনসাধারণ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বন্যার দরুণ আসামের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

আসামে বন্যা

পরিশিষ্ট—(৬)

আসামী ভাষা ও সাহিত্য

এখানে আসামী ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব। রামায়ণ মহাভারতের কথা ছাড়িয়া দিই, আসামপ্রদেশের পূর্ব্বনাম কামরূপ রাজ্য ছিল। কামরূপ রাজধানী ছিল। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্য ভারতসীমার পূর্ব্ব অধিবাসী আহোম নামক অনার্য্য রাজার অধীনে আসে। ক্রমে ক্রমে এই অনার্য্য আহোম জাতি আর্য্য-জাতির সহিত মিশিয়া আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অনার্য্যজাতির শেষ রাজার নিকট হইতে ইংরাজ আসাম রাজ্য অধিকার করেন—একথা আমরা গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করিয়াছি।

আহোম রাজাদের রাজত্বকালে কামরূপ রাজ্যে **অহমী** এবং অন্য

অ-সংস্কৃত শব্দ সে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দও বিকৃতি লাভ করিল। এইরূপ শব্দ-বহুল ভাষা বর্ত্তমানে আসামী ভাষা নাম পাইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—"কামরূপের পুরাতন ভাষা বাঙ্গালার মতন ছিল। ভাষা-ভেদ অগ্রাহ্য করিলে বলিতে পারা যায় সে ভাষাও বাঙ্গালা ভাষা এক ছিল। (১) আসামী, বাঙ্গালা, মৈথিলী ভাষা অভিন্ন ছিল, এমন কি লিখিবার অক্ষরও অভিন্ন ছিল, ব্যাকরণও অভিন্ন ছিল। একথা আসামীরা মানেন না। গেইট্ সাহেব বলেন—"It may be pointed out, however that the possession or otherwise of a separate literature is generally regarded as one of the best tests to apply, and that, if this be taken as the criterion, Assamese is believed to have attained its present state of development independently of Bengali; and it is the speech of a distinct nationality which has always strenuously resisted the efforts which have been made to foist Bengali on it. (২)"

আসামী, উড়িয়া, বাঙ্গালাও মৈথিলী ভাষায় পরস্পরের মিলন-সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে এই চারি ভাষার মূলই সংস্কৃত। কিন্তু সে যে কোন্ সুদূর অতীতে মূলকে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করাও সুকঠিন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সহিত সংস্কৃতমূলক আসামী, উড়িয়া বাঙ্গালা ও মৈথিলী, হিন্দি প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক ভাষা হইলেও মূল হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সরিয়া গিয়াছে।

আসামী ভাষায় 'বুরুঞ্জি' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। আসামের ঐতিহাসিক

(১) 'প্রবাসী'—বৈশাখ, ১৩১৮, আসামী ভাষা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম. এ. বিদ্যানিধি।

(২) Gaits, History of Assam. Page—332.

গেইট্‌ সাহেব 'বুরুঞ্জির' অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়াছেন। আহোমদের কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"The Ahom's were a tribe of Shans who migrated to Assam early in the thirteenth century. They were endowed with the historical faculty in a very high degree ; and their priests and leading families possessed **Buranjis,** or histories, which were periodically brought up to date. These were written on oblong strips of bark and were very carefully preserved and handed down from father to son." বাঙ্গালা দেশের কুলজীগ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বুরুঞ্জি লেখা আরম্ভ হইয়াছে। বুরুঞ্জি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ। বু—মানে অজ্ঞ লোক ("ignorant persons") রুণ-শিক্ষা ("teach") ঞ্জি ভাণ্ডার ("store" or granary")। আসামী অভিধান প্রণেতা ৺হেমচন্দ্র বড়ুয়া বুরুঞ্জি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দিয়াছেন,—অহমী ভাষায় বু—পুরাণ কথা—রঞ্জ বা লঞ্জ বর্ণনা। অর্থাৎ পুরাণ কথার বর্ণনা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম. এ. বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন—"আমার বোধ হয় সংস্কৃত পুরাপঞ্জী হইতে আসামী বুরুঞ্জি শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গালা কুলজী, ঠিকজী ঠিক্‌ এইরূপ শব্দ। কুলপঞ্জী হইতে কুলজী। ঠিকজী শব্দ কেহ কেহ ঠিকুজী বলে। সে যাহাই হউক না কেন বুরুঞ্জি অতি প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।"

আসাম প্রদেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় চারিশত মাইল দীর্ঘ হইবে। এত বড় প্রদেশের উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রত্যেক স্থানের জেলা বিশেষে যেমন গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তেজপুর, নওগাঁ প্রভৃতির কথ্য ভাষা এক হইতে পারে না।

কোচবিহারের নরনারায়ণ যখন কামরূপে রাজত্ব করিতেন, তখন আকবরশাহ দিল্লীর সম্রাট। এ সময়ে কামাখ্যার মন্দিরে নরবলি সহ তান্ত্রিক-পূজা প্রচলিত ছিল। নওগাঁয়ে শঙ্করদেব নামক এক কায়স্থ এই সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। মাধবদেব নামক তাঁহার এক শিষ্যও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ও উৎকলে যেমন ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা যুগান্তর উপস্থিত করেন, ইঁহারাও নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া আসাম অঞ্চলে তেমনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া যুগান্তর আনয়ন করেন। এখানে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের লিখিত ভাষার আদর্শ দেখাইয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

শঙ্করদেবের রচনা এইরূপ ঃ—

"আপনাকে ঈশ্বর স্বরূপে ধ্যান করি।
এহি মন্ত্র উচ্চারিব মাধবক স্মরি॥
গ্রহগণ কেতু হন্তে মিলে যিতো ভয়।
সর্প ব্যাঘ্র ভূতাদিত যিবা ভয় হয়॥
শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ অস্ত্ররকীর্ত্তনে ;
সবে রিষ্ট নষ্ট মোর হৌক এতিক্ষণে॥
এহি সত্য মোর যত উপদ্রব মানে।
সবে নষ্ট হৌক কৃষ্ণ নাম সুমরণে॥
যিতো ইতো কবচক শুনে একমন।
যদি বা আদর ভাবে করয় ধারণ॥
তাহাক্কে সমস্ত প্রাণী করয় বন্দন।
সকলে ভয়ত সি তো হোঅয় মোচন॥"

মাধবদেবের রচনা হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"পরভাতে শ্যামকানু ধেনু লইয়া সঙ্গে।
বংশীর নিষানে বৃন্দাবনে চলে রঙ্গে॥
জগতর গুরু হরি কাচিগোপকাছে।
আভীর বালক বেঢ়ি চলে আগে পাছে॥
শিক্যা বান্ধি চান্দি কান্ধে লৈয়া দধিভাত।
মাথায় চান্দনি জড়ি সাজে জগন্নাথ॥
বাম কাখে শিঙ্গা বেত নেত করুচেলী।
বহু রসে লাসে বেশে চলে করি কেলি॥
অসংখ্য সহস্র শিশু ধেনু বৎসগণ।
শিঙ্গা শঙ্খ বেণু রবে পূরয়ে গগন॥
নানান খেলান খেলে বহুভাবে গায়ে।
নানান বিনোদ রসে ভুবন ভুলায়ে॥
বৈকুণ্ঠর পতি হরি বনে চারে ধেনু।
কহয়ে মাধব গতি কানুপদ রেণু॥

প্রাচীন আসামী ভাষার সহিত বর্ত্তমান আসামী ভাষার প্রভেদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। প্রাচীন কালের আসামী সাহিত্যে—শ্রীধরকন্দলী, ভট্টদেব, শঙ্করদেব, মাধবদেব, অনন্ত-কন্দলী প্রভৃতির নাম স্মরণীয়।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত আসামীগণ স্বীয় ভাষার উন্নতি-কল্পে ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। তাহার ফলে বিবিধ পত্রিকা ও পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।